পবিত্র কোর'আনে আধুনিক সামুদ্রিক বিজ্ঞান

ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের

প্রাক্তন অধ্যাপক, ইন্‌স্টিটিউট অব মেরিন সাইন্সেস এন্ড ফিশারিস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

professorabdulkader@gmail.com

ভূমিকা

'প্রজ্ঞাপূর্ণ বিজ্ঞাময়ময় কোরআন' শব্দটি পড়লেই এ পবিত্র গ্রন্থটি কিভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিজ্ঞানময় হল তা সকল পাঠকের জানতে ইচ্ছা করা স্বাভাবিক। সারা কোরআন শরীফটির তফসির পড়লে একজন পাঠক বুঝতে পারবেন যে ইহা কত প্রজ্ঞাময় একটি গ্রন্থ। জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যার কিছু না কিছু এতে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও বর্ণিত হয় নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এতে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধে যে এতে এত ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে তা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। এ পবিত্র গ্রন্থে সমুদ্র সম্বন্ধে ৫৫টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাদের মুসলমানদের জানা উচিত। তাহলে আমরা অমুসলিম ভাইদের সম্মুখে কোরআনের এসকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগর্ভ কথা তুলে ধরতে পারব। আল্লাহ চাহেন ত এতে কেউ কেউ হেদায়েতের মত মহা উপকার লাভ করতে পারবেন।

আমি কোরআন শরীফের তফসীরসহ বাংলা অনুবাদ পড়তে গিয়ে যেখানেই সমুদ্র সম্বন্ধে কোন আয়াত পেয়েছি তা নোট করে রেখেছি। যেহেতু আমি একজন সামুদ্রিক বিজ্ঞানের ছাত্র তাই মনে মনে ইচ্ছা ছিল সময় ও সুযোগ পেলে আমি ইনশাল্লাহ এগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লিখব। এ পুস্তকে ঐ কাজটিই করার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া কোন কোন Jack of all trades, Master of none (সবজান্তা কিন্তু কোনটিরই ওস্তাদ নয়) আছেন যারা বলে থাকেন যে, কোরআনে কোন কোন আয়াতে পূর্ণতার অভাব রয়েছে। যেমন - এরূপ কিছু সবজান্তা ইন্টারনেটে লিখেছেন যে, সমুদ্রের ভিতর প্রবিষ্ট নদীর মিঠা পানি ও সমুদ্রের লোনা পানির মধ্যে এক অন্তরায় (Pycnocline) থাকার কারণে ওরা মিশে যায় না এ কথা কোরআনে উল্লেখ আছে কিন্তু কোরআনে দুই সমুদ্রের লোনা পানি যখন একত্র হয় তখন ওরাও অন্তরায়ের কারণে মিশে যায় না একথা কেন উল্লিখিত হয় নাই। আমি দেখিয়েছি যে, কোরআনে এরূপ আয়াতের উল্লেখ আছে (সুরা নামল ঃ আয়াত ৬১) যেখানে দুটি সমুদ্রের পানি একত্রিত হলেও অন্তরায়ের কারণে ওরা মিশে যায় না। ভূমধ্য সাগরের পানি আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করলেও ওদের পানি মিশে যায় না। মহাসমুদ্রগুলোর পরস্পরের মিলনস্থলেও লবণাক্ততা, উষ্ণতা ও ঘনত্বের তারতম্যের কারণে এরূপ অন্তরায় পরিদৃষ্ট হয়।

আশা করি এ পুস্তক দ্বারা সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং সামুদ্রিক বিজ্ঞান (Marine Sciences), সমুদ্রবিজ্ঞান (Oceanography), মাৎস্যবিজ্ঞান(Fisheries), প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology), উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany), পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়নবিজ্ঞান (Chemistry), আবহাওয়াবিজ্ঞান (Meterology), চিকিৎসাবিজ্ঞান (Medical Sciences) ও জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy)এর ছাত্ররা এবং নাবিকরাও উপকৃত হবেন। তাছাড়া সমুদ্রতীরে রৌদ্রস্নানকারী পুরুষ ও মহিলারা এবং সমুদ্রে সন্তরণকারীরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সাবধান হতে পারবেন।

লিখতে গিয়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসির ও ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়েছি। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বিজ্ঞানের আধুনিক বরাত (Reference) দেয়ার চেষ্টা করেছি। জ্ঞান-পিপাসু ও সমঝদার পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য হলেই পরিশ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করি।

এ গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য আমি -------- লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী জনাব ---------- সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ মোঃ আব্দুল কাদের

প্রাক্তন প্রফেসার ও ডিরেক্টর, ইনষ্টিটিউট অব

মেরিন সাইন্সেস এন্ড ফিশারিজ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম কসমোপলিটন আ/এ জামে মসজিদের সম্মানিত পেশ ইমাম ও দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য শিক্ষাপরিচালক **হাফেজ মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ আনসারি সাহেব** -এর

অভিমত

আল্লাহ তাআলা এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মানুষের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে মানুষ বিশাল পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মানুষ বিশাল সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আসমান-জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন আছে। যারা দাঁড়িয়ে-বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান-জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে। অতঃপর তারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। সব পবিত্রতা কেবল তোমারই, অতএব আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। (সুরা আল ইমরান, আয়াত : ১৯০-১৯১)।

পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশজুড়ে আছে সমুদ্রজগত। তাতে আমাদের চোখের আড়াল হয়ে আছে আল্লাহ তাআলার অপরূপ সৃষ্টির অপার কুদরত ও মহিমা। এ নিয়ে মানুষের চিন্তাশক্তি ও গবেষণা সুদীর্ঘ কাল যাবত হয়ে আসছে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলার বিশাল সৃষ্টিজগত নিয়ে বর্ণিত আছে নানা তথ্য-উপাত্ত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ইনস্টিটিউট অব মেরিন সাইন্সেস এন্ড ফিশারিজের প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক শ্রদ্ধাস্পদ **ড. মোহাম্মাদ আব্দুল কাদের** প্রণীত **'পবিত্র কোরআনে আধুনিক সামুদ্রিক বিজ্ঞান'** একটি অনন্য বই। বইটি কোরআন, হাদিস ও আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্তে সমৃদ্ধ। এতে সমুদ্রবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কোরআনের আয়াত ও হাদিস এবং নবী-রাসুল (আ.)-এর ইতিহাস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বইটিতে প্রাজ্ঞ লেখক সমুদ্রবিষয়ক নানা তথ্য প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন, যা লেখকের বহুমুখী প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ।

আশা করি, বইটি পাঠ করে পাঠক মহল উপকৃত হবেন। বিশেষত, মাদরাসা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বইটি থেকে অত্যধিক লাভবান হবে। তা পাঠ করে একজন সাধারণ মানুষের কাছেও উন্মোচিত হবে জ্ঞানের নতুন জগত। আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের লেখক-পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বইটি থেকে উপকৃত করুন এবং আখেরাতের দিনে তা পাথেয় হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

মাআসসালাম

১২.১০.২০১৮

হাফেজ মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ আনসারি

পেশ ইমাম, কসমোপলিটন আ/এ জামে মসজিদ চট্টগ্রাম।

শিক্ষাপরিচালক, দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদরাসা,

নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

আয়াত সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১	১
২	২
৩	৫
৪	৬
৫	৮
৬	৮
৭	৯
৮	১০
৯	১১
১০	১২
১১	১৩
১২	১৪
১৩	১৫
১৪	১৫
১৫	১৬
১৬	২৩
১৭	২৪
১৮	২৫
১৯	২৭
২০	২৮
২১	২৮
২২	২৯

আয়াত সংখ্যা	পৃষ্ঠা
২৩	৩০
২৪	৩০
২৫	৩১
২৬	৩১
২৮	৩২
২৮	৩৩
২৯	৩৪
৩০	৩৫
৩১	৩৫
৩২	৩৭
৩৩	৩৮
৩৪	৩৯
৩৫	৩৯
৩৬	৪০
৩৮	৪১
৩৮	৪২
৩৯	৪৪
৪০	৪৬
৪১	৪৬
৪২	৪৬
৪৩	৪৭

আয়াত সংখ্যা	পৃষ্ঠা
৪৪	৪৭
৪৫	৪৭
৪৭	৪৮
৪৮	৪৯
৪৮	৪৯
৪৭	৪৯
৫০	৪৯
৫১	৪৯
৫২	৫০
৫৩	৫০
৫৪	৫১
৫৫	৫২

কোর'আন শরীফে সমুদ্র, সমুদ্র-সম্পদ, সমুদ্রের পানি ও এর উপর চলমান নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে ৫৫টি আয়াত নাযিল হয়েছে। যদিও আরব দেশ একটি উপদ্বীপ অর্থাৎ এর তিন দিক পানি দ্বারা বেষ্টিত তথাপি আমাদের নবী করিম (সাঃ) জীবনে একবার মাত্র সমুদ্র দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করার সময় শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রচলিত পথে না গিয়ে কিছু পথ লোহিত সাগরের কিনার ধরে একটু ভিন্ন পথে গিয়েছিলেন । আমার জানা মতে তিনি আর কোন দিন সমুদ্র দেখেন নাই। কোরআন শরীফ যদি তাহার নিজস্ব রচনা হত তবে সমুদ্র সম্বন্ধে এতগুলো জ্ঞানগর্ভ কথা তিনি কখনই বলতে পারতেন না। অন্য কেউ বলে দিলেও তা সম্ভব হত না, কারণ কোরআন শরীফের ভাষা আর রাসুল (সাঃ)এর ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। হাদীছ শাস্ত্রের ভাষা রাসুল (সাঃ)এর নিজের ভাষা। আরবীতে সেটা খুবই উন্নত ও শুদ্ধ ভাষা। কারণ মাতৃভাষা আরবী শিখার শৈশবকালটি তিনি কাটিয়েছিলেন তাঁর ধাত্ মাতা বিবি হালিমার গৃহে ; আর হালিমার গোত্রের আরবী ভাষা তখনকার দিনে সবচাইতে শুদ্ধ আরবী ভাষা ছিল। কিন্তু কোরআন শরীফের আরবী ভাষা অলঙ্কারবহুল যাহা হাদীসশাস্ত্রে অনুপস্থিত। যা হউক, আমি আরবী ভাষার পন্ডিত নই। কোরআন শরীফের ভাষা যে আল্লাহর নিজস্ব ভাষা সেটি মুসলিম ও অমুসলিম আরবী ভাষাবিদগণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

কোর'আন শরীফে সমুদ্র সম্বন্ধে যেসকল আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করছি ঃ

(১)﴿ وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴾

অর্থ – আর যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফিরআউনের লোকদেরকে অথচ তোমরা দেখছিলে।

(১নং পারা ঃ সুরা নং ২ বাক্বারা ঃ রুকু নং ৬ ঃ আয়াত নং ৫০)।

কাফের বাদশাহ ফিরআউন যখন মুসা (আঃ)কে ধরার জন্য তার সৈন্যবাহিনীসহ বের হয়ে পড়ল তখন আল্লাহ মুসা (আঃ)কে অহি করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেন তার অনুসারীদেরকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য পাড়ে চলে যান এবং এ নিশ্চয়তাও দিলেন যে ফিরআউন কোনভাবেই তাদেরকে ধরতে পারবে না । যখন মুসা (আঃ) রাত্রিবেলায় বের হয়ে সমুদ্র পাড়ে পৌছে গেলেন তখন আল্লাহ তা'লার নির্দেশে তিনি সমুদ্রের পানির উপর তার লাঠির দ্বারা আঘাত করলেন। তখন সমুদ্রের পানি বিভক্ত হয়ে বারটি শুকনো রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। মুসা (আঃ) তার বার গোত্রের অনুসারীদেরকে নিয়ে ঐসব রাস্তা দিয়ে সহজে সাগরের অপর পাড়ে চলে গেলেন । ফিরআউন যখন পিছনে ধাওয়া করে সমুদ্রের কিনারে এসে পৌছল তখন এ অদ্ভূদ ঘটনা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল কিন্তু গর্বভরে তার লোকদেরকে বলল যে, এসব রাস্তা তার হুকুমেই হয়েছে। সুতরাং তারা যেন তার পেছনে পেছনে চলে শুষ্ক রাস্তাসমূহের উপর দিয়ে সাগর পাড়ি দেয় এবং মুসার লোকদেরকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। তারা যখন সকলেই সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করল তখন আল্লাহর হুকুমে প্রতিটি রাস্তার দুদিকের পানি একত্র হয়ে গেল এবং সকলেই সমুদ্রে ডুবে মারা গেল। এভাবেই আল্লাহ তা'লা সমুদ্রকে বিভক্ত করে তার মাঝে রাস্তা তৈরী করে মুসা (আঃ) ও তার লোকজনকে সমুদ্র পার করে বাঁচিয়ে দিলেন এবং পানিকে পুনরায় একত্রিত করে ফিরআউন ও তার বাহিনীকে ডুবিয়ে মারলেন,আর সে সময় মুসা (আঃ) ও তার লোকজন সমুদ্রের ওপাড় থেকে ফিরআউন ও তার বাহিনীর ডুবে যাওয়ার দৃশ্যটি অবলোকন করছিলেন। এখানে সমুদ্রটি কোন সমুদ্র ছিল সে ব্যাপারে তফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে সেটা ছিল ভূমধ্যসাগর এবং কারো কারো মতে সেটা ছিল লোহিত সাগর। ভূমধ্য সাগর হলে মুসা (আ:) উত্তর দিকে গিয়েছিলেন আর লোহিত সাগর হলে তারা পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন। সাগর শুকিয়ে রাস্তা হয়ে যাওয়ার

কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই । নবী রসুলদেরকে আল্লাহ তা'লা ওহির মাধ্যমে এমন কিছু জানিয়ে দেন যা সাধারণ লোকের জ্ঞানের অগোচর থাকে। যেমন অন্য আয়াতে মুসা নবীকে আল্লাহ তা'লা আগেই বলে দিয়েছিলেন যে "সাগরের মধ্য দিয়ে শুষ্ক রাস্তা নির্মাণ কর, পেছন থেকে এসে তোমাদেরকে ধরে ফেলার ভয় করো না কিংবা সাগরে ডুবে মরার ভয় করো না।" তাই মুসা (আঃ) নিঃশঙ্ক ছিলেন। বণি ইসরাইলরা যখন সামনে সাগর ও পেছনে ফিরাউনের বিশাল বাহিনী দেখল তখন তারা ধরা পড়ার ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল এবং বলতে লাগল যে তাদেরকে এখন কে বাঁচাবে। মুসা (আঃ) তাদেরকে অভয় দিয়ে বললেন যে, তাদের সাথে আল্লাহ আছেন। হিযরতের পথে কিংবা অন্য যে কোনও বিপদের সময় নবীদের ঈমান কেবল বাড়ে। কারণ তাদের সাথে আল্লাহ সরাসরি অথবা অহির মাধ্যমে কথা বলেন। সাধারণ লোকদের ঈমান বাড়ে ও কমে। আল্লাহর কোন কুদরত অথবা নবী-রাছুলের কোন মোজেজা দেখলে বেড়ে যায়, না দেখলে সাধরণতঃ কমতে থাকে। আখেরী নবী মোহাম্মদ (সাঃ)কে যখন আল্লাহ তা'আলা হিযরত করে মদীনায় চলে যেতে আদেশ করলেন, তখন তিনি তার সাহাবী হযরত আবু বকর (রা)কে সঙ্গে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রা পথে চওড় পাহাড়ের গুহায় অত্মগোপন করলেন। সে সময় কাফেরদল তার খোঁজে চওড় পাহাড়ের কাছাকাছি পৌছে গেল। এমনকি গুহা থেকে আবু বকর (রাঃ) তাদের পা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি রাছুল (সাঃ)কে বলতে লাগলেন যে, কাফেররা একটু নিচের দিকে তাকালেই তাদেরকে দেখে ফেলবে ; তারা সংখ্যায় অনেক অথচ তারা মাত্র দুজন। রাছূল (সাঃ) বললেন, "আমরা দুজন নই, আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন।" কারণ তিনি জানতেন যে, তাকে হিযরত করতে আল্লাহ তা'লাই আদেশ করেছেন, সুতরাং তিনি অবশ্যই মদীনায় পৌছবেন। কাফেরদল যখন গুহার মুখে মাকড়সার জাল এবং কবুতরের ডিম দেখল তখন তারা নিশ্চিত হল যে, গুহার ভেতর কোন মানুষ ঢুকে নেই, ঢুকলে অবশ্যই মাকড়সার জাল ছিড়ে যেত ও কবুতরের ডিম পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যেত। তখন তারা ফিরে এল। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করলেন এবং নবী (সাঃ) ও আবু বকর (রা)এর ঈমান বেড়ে গেল।

(٢) ﴿ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْیَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّ تَصْرِیْفِ الرِّیٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴾

অর্থ - নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং সমুদ্রে জাহাজের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে । আর আল্লাহ তা'লা আসমান থেকে যে পানি (বৃষ্টি) নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীব-জন্তু। আর বায়ু-পরিবর্তন যা মেঘমালাকে তাদের অনুগতরূপে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণশীল করে – নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।

(২য় পারা ঃ সুরা নং ২ বাক্বারা ঃ রুকু নং ২০ ঃ আয়াত নং ১৬৪)।

এখানে আসমানসমূহ বলা হয়েছে । কোরআন শরীফে যেখানে আসমানের কথা বলা হয়েছে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আসমানসমূহ বলা হয়েছে। আাসমান বলতে আমরা যে আসমান দেখি সেটা ত একটি মাত্র আসমান। তবে এখানে আসমানের বহুবচন কেন বলা হল? তবে কি আরও আসমান রয়েছে ? নিশ্চয়ই রয়েছে, কারণ কোরআনের কথা মিথ্যা হতে পারে না। পার্থিব বায়ুমন্ডলের বাইরে বিশাল খালি জায়গাকে বিজ্ঞানের ভাষায় মহাশূণ্য বা মহাকাশ (Space) বলা হয়। সকল সজীব বস্তু, গ্রহমন্ডল, নক্ষত্রমন্ডল, ছায়াপথসমূহ, ধূলিমেঘমালা, আলোক এবং অন্য সকল রকমের বস্তু ও শক্তি (Energy) এমনকি সময়ও বিশ্বজগৎ বা মহাবিশ্বের(Universe) অন্তর্ভূক্ত। মহাবিশ্বের জন্মের পূর্বে সময়, মহাশূণ্য কিংবা কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। কোনও

কোনও বিজ্ঞানী একাধিক সমান্তরাল মহাবিশ্ব (Parallel Universes) থাকার কথা বলেছেন।১ অবশ্য এর বিপক্ষেও কোনও কোনও বিজ্ঞানী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। মহানবী (সাঃ) মেরাজের রাত্রে সপ্তম আকাশ বা মহাকাশ এবং মহাবিশ্ব পাড়ি দিয়ে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে এসে তাঁর সাথে একান্তে কথা বলেছিলেন।

পৃথিবী তার অক্ষরেখার চতুর্দিকে প্রতি ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে একবার নিজেকে আবর্তিত করে। এই আবর্তনকে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তন বলে। আমরা জানি সে সময় এর যে পৃষ্ঠে সূর্য কিরণ পতিত হয় সেখানে দিন হয় এবং এর অন্ধকার পৃষ্ঠে তখন রাত্রি থাকে।

নক্ষত্রসমূহ এবং অন্যান্য আসমানী বস্তুসমূহের আকাশের এক পার্শ্ব হতে অন্য পার্শ্ব পর্যন্ত প্রাত্যহিক গতিকে আহ্নিক গতি বলে। এ গতি পৃথিবীর পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তনের কারণে সংঘটিত হয় যা আসমানী বস্তুসমূহের পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে আপাত (Apparent) গতি লাভের কারণ হয়ে থাকে।

বিশ্বজগতে বিলিয়ন বিলিয়ন ছায়াপথ রয়েছে এবং প্রতিটি ছায়াপথে মিলিয়ন মিলিয়ন অথবা বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে। বিশ্বজগতের (Universe) ব্যাস কম পক্ষে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ (Light years) বলে বিশ্বাস করা হয় । প্রায় ১৩ বিলিয়ন বর্ষ পূর্বে বিগ ব্যাং (BigBang)এর মাধ্যমে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হতে শুরু করে এটা কেবল প্রসারিতই হচ্ছে।২ এক আলোকবর্ষ = ৯.৪৬০৫২৮৪ e ১২ কিলোমিটার।

মহাজগৎ (Cosmos) একটি পূর্ণাঙ্গ একতান ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি যা প্রাকৃতিক নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিগ ব্যাং (BigBang) মতবাদ অনুসারে বিশ্বজগৎ শুরু হয়েছিল একটি ক্ষুদ্র একাকিত্ব বা একতা (Singularity) হতে এবং পরে সেটা ১৩.৮ বিলিয়ন বছর ধরে স্ফীত হতে হতে আমাদের দৃশ্যমান পরিচিত বিশ্বজগৎ আজকের এ সুশৃঙ্খল (well-ordered) মহাজগৎ (Cosmos)এর রূপ লাভ করেছে।

আমরা জেনেছি যে, নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে মানুষ, পশু কিংবা কোন যানবাহন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার বৈজ্ঞনিক সূত্রটি আবিষ্কার হয়েছে ১৬৮৬ সালে। এর হাজার হাজার বছর পূর্বেও প্রাণী ও যানবাহন সামনের দিকে এগুত। জলে নৌকা কিংবা অন্যান্য জাহাজ আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে ভাসমান হয়। এটাও আবিষ্কার হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে (খ্রীঃপূঃ ২৮৭-২১২)। এর হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি পানিতে ভাসত। নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি অনুকূল বায়ুতে দাড়, পাল কিংবা ইঞ্জিনের সাহায্যে বয়ে যায় সেই নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারেই অর্থাৎ যে শক্তিতে কোন বস্তু পিছনে ঠেলে সেই একই শক্তিতে সেটা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। স্থলেও একই নিয়মে কোন বস্তু কিংবা প্রাণী সামনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রাণী যে শক্তিতে পিছন দিকে পা ঠেলে সে একই শক্তিতে বিপরীত দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আধুনিক যানবাহনের পিষ্টন পিছন দিকে ঠেললে গাড়ী সমান শক্তিতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। পেছন দিকে যাওয়ার সময়ও একই নিয়ম কাজ করে।

আল্লাহ তা'লা আসমান থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করে মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেন। আমরা জানি সূর্যের তাপে পানি [প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বসন (Respiration) এবং উদ্ভিদের প্রস্বেদনের (Transpiration) মাধ্যমে ভৌমপানি (Ground water), হ্রদ, নদী ইত্যাদির পানি, তুষার ও বরফ, ভূতল (Surface) এর পানি ও সাগর মহাসাগরের পানি] বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমন্ডলে উঠে যায় এবং সেখানে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় ও মেঘমালার ভিতর বৃষ্টিকণা অথবা তুষারে পরিণত হয় এবং তা ভারী হয়ে গেলে বৃষ্টি অথবা তুষাররূপে পুণরায় ভূপৃষ্ঠে পতিত (Precipitation) হয় । এ প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় পানি চক্র (Water cycle) বলে (চিত্র ১)।

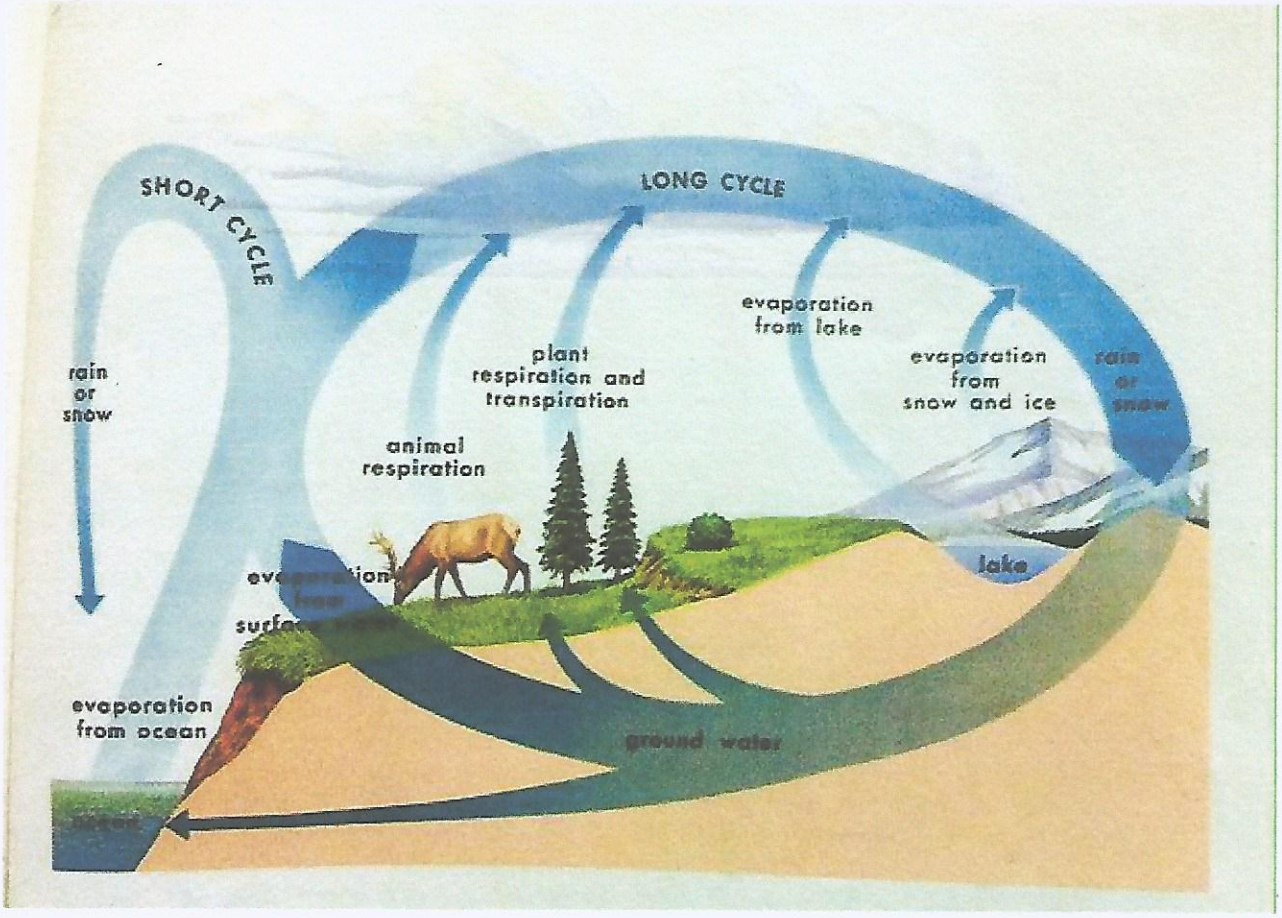

চিত্র নং ১। পানি চক্র (Water cycle)

কিছু পানি মাটির ভেতর চলে যায় আবার কিছু বিভিন্ন জলাশয়ে গিয়ে পতিত হয় এবং তথা হতে নদী, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্রে বাহিত হয়। মাটির ভেতর হতে গাছের মূলের মাধ্যমে পানি গাছের পত্ররন্ধ্রগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে (Substomatal chamber) গিয়ে সঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য যে, গাছের পাতার উপরিতল হতে গাছের ভেতরে উত্থিত পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যায়। এ পদ্ধতিকে প্রস্বেদন বলা হয় (Transpiration) । প্রস্বেদনের ফলে গাছের ভেতর পানির যে হ্রাস ঘটে তা এক প্রকার শোষণ শক্তির (Suction force) সৃষ্টি করে এবং এ শক্তি গাছের জাইলেম (Xylem) নামক এক প্রকার সরু ফাঁপা নালীর (Tubes) মাধ্যমে গাছের মূল হতে পানি উপরে টেনে তুলে। অতঃপর পত্ররন্ধ্রগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত পানি সূর্যকিরণ ও ক্লোরোফিলের (Chlorophyll) উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্রের (Stoma) মাধ্যমে পত্ররন্ধ্রগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট বায়ুমন্ডলের কার্বনডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরী করে এবং গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরীর এ পদ্ধতিকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলা হয়। এ গ্লুকোজ গাছ ও প্রাণীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গাছে তৈরী গ্লুকোজ ফ্লোয়েম (Phloem) নামক আরেক প্রকার সরু ফাঁপা নালীর মাধ্যমে গাছের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ হয়। অক্সিজেন গাছ ও প্রাণীর প্রশ্বাসে ব্যবহৃত। লিভারওয়ার্টস (Liverworts), হর্ণওয়ার্টস (Hornworts), মস (Mosses) ইত্যাদি যেসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জাইলেম ও ফ্লোয়েম থাকে না সেসকল উদ্ভিদে পানি উদ্ভিদদেহের এক কোষ হতে অন্য কোষে সঞ্চালিত হয় এবং পানির এরূপ সঞ্চালন মাত্র কয়েক কোষ পুরু দেহে সম্ভবপর হয়। পানি পেয়ে ও খাদ্য তৈরীর মাধ্যমে এভাবে শুষ্ক যমীন সজীব ও শস্য- শ্যামল হয়ে উঠে। আয়াতে

একেই মৃত যমীনকে সজীবকরণ করা বুঝানো হয়েছে। পশুপাখী সেখানেই যায় এবং স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে যেখানে খাদ্য, পানীয় ও নিরাপদ আশ্রয় পায়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের শস্য-শ্যামল জায়গায় জীবজন্তুর বিস্তার লাভ ঘটে।

উল্লেখ্য যে, জলীয় বাষ্পের অণু নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু অপেক্ষা হালকা। আর যেহেতু বায়ুমন্ডলের প্রায় ৯৯% নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু দ্বারা গঠিত, তাই নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন হতে হালকা জলীয় বাষ্প বায়ুতে ভেসে বেড়ায়। বায়ু যেদিকে প্রবাহিত হয় জলীয় বাষ্পও সেদিকে প্রবাহিত হয়। উর্দ্ধাকাশের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প যখন ঘনিভূত হয়ে দৃশ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিবিন্দুতে পরিণত হয় তখন সেগুলো মেঘমালার সৃষ্টি করে। এসব মেঘমালা যেহেতু বায়ুতে ভাসমান থাকে তাই বায়ু যেদিকে প্রবাহিত হয় এরাও সেদিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ বায়ুর অধীনে ঘুরে বেড়ায়। আর "করিওলিস ইফেক্ট" ("Coriolis effect") নামক এক প্রকার শক্তি (Force) বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র স্রোতের দিক নির্ণয় করে। উত্তর গোলার্দ্ধে বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোত ডান দিকে ঘুরে (Deflect) যায় এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে এরা বাম দিকে ঘুরে যায়। ১৮৩৫ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী গ্যাসপার্ড গোস্টেভ ডি করিওলিস (Gaspard-Gustave de coriolis) বর্ণনা করেন যে, করিওলিস ইফেক্ট এক প্রকার শক্তি যা পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে প্রক্ষিপ্ত বস্তুনিচয় (Projectiles) কিংবা বায়ু প্রবাহ ইত্যাদির মত কোন সরল পথে চলন্ত বস্তুকে উত্তর গোলার্দ্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাম দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

এখন আমরা দেখলাম যে, এ একটি মাত্র আয়াত বিজ্ঞানের কতগুলো সূত্র, শক্তি ও সত্যের কার্যকারীতা প্রকাশ করছে ! তাহলে পাঠকগণ ভেবে দেখুন "নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য" - কথাটি কি সত্য নয় ?

(৩) ﴿ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ ۚ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴾

অর্থ - তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ও উহার খাদ্য হালাল করা হলো - তোমাদের ও মুছাফিরদের উপকারার্থে এবং হারাম করা হলো তোমাদের প্রতি ডাঙ্গার শিকার যে পর্যন্ত তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

(৬-৭ পারা ঃ সুরা নং ৫ মায়িদাহ্‌ ঃ রুকু নং ১৩ ঃ আয়াত নং ৯৬)

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীবজন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ করা ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদিসে মাছ ও টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দুটির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন – "আমাদের জন্য দুটি মৃত হালাল - মাছ ও টিড্ডি।" সুতরাং বুঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মৃত মাছ ও টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভূক্ত হবে না। এ দুটি যবেহ না করেও খাওয়া যাবে। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পঁচে যায় এবং পানির উপরে পঁচা অবস্থায় ভেসে উঠে তবে তা খাওয়া যাবে না । কিন্তু মাছ সাধারণতঃ মরে গেলে কিংবা প্রায় মৃত অবস্থায় পৌছলেই পেট ভাসিয়ে পানির উপর ভেসে উঠে। এগুলোও খাওয়া হালাল। মৃত মাছ ও টিড্ডি হালাল হওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। সম্ভবতঃ সকল নবী রাছুলের সময়ই এগুলো হালাল ছিল। কোর'আনে স্বাভাবিক নিয়মগুলোকে স্বাভাবিকই রাখা হয়েছে। তাছাড়া মাছ পানিতে থাকে, পানিতে ধোলে সবকিছুই পরিস্কার হয়। মরা মাছ পানির দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই পরিস্কার হয়ে যায় এবং পরিস্কার পানিতে রোগ জীবাণু কম থাকে বলে মৃত মাছ আপনাতেই জীবাণুমুক্ত থাকে, তাই একে যবাই করে দূষিত রক্ত (রক্ত রোগজীবাণু বহন করে

দূষিত হয়ে সারা দেহে জীবাণু ছড়ায়) বের করে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে না। আর টিড্ডি জাতীয় পতঙ্গে লাল রক্ত থাকে না, তাই এদেরকে যবাই করে রক্তের জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে না। মুসাফিরদের প্রসঙ্গ এজন্য আনা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর সময় একদল সাহাবী সমুদ্রের কিনারে গিয়ে খাদ্যাভাবে পড়েন। তখন একটি বিশাল আকৃতির মৃত তিমি (যাকে হাদীছে আম্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে) সাগর কিনারে এসে পড়ে। সেটা সাহাবীরা দীর্ঘ আঠার দিন ধরে খেয়ে শেষ করতে পারেন নি। কিছু পরিমাণ অংশ রাছুলুল্লাহর জন্য নিয়ে আসেন এবং সেটা খাওয়ার বৈধতা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সেটা খাওয়ার ব্যাপারে বৈধতা দেন এবং নিজেও কিছু খান। যেহেতু সাহাবীরা মুসাফির ছিলেন তাই আয়াতে মুসাফিরদের কথা এসেছে। হাদীছে উল্লিখিত আম্বরকে তিমি বলেছি এজন্য যে, সাহাবীদের দলটি আরবের পূর্ব সমুদ্র উপকূলে গিয়েছিলেন এবং তারা সংখ্যায় তিনশত জন ছিলেন -(ইবনে কাছীর) এবং আরবের ঐ উপকূলে তিমি পাওয়া যায়।

"حُوْت" তিমির আরবী শব্দ। আরবের পূর্ব দিকের সমুদ্রে তিমি বিশেষ করে হাম্পবেক তিমি (Humpback) (اَلْحُوْتُ الْاَحْدَبُ) বেশী পাওয়া যায় যার এক একটির দৈর্ঘ্য ১২-১৬ মিটার ও ওজন ৩৬,০০০ কেজি পর্যন্ত হয়। আম্বর হয়ত তিমির স্থানীয় অথবা প্রাচীন আরবী শব্দ হতে পারে। হাম্পবেক তিমির বৈজ্ঞানিক নাম *Megaptera novaeangliae*। তিমি মাছ নয়, আধুনিক বিজ্ঞানে একে স্তণ্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কারণ এদের স্তন আছে ও এদের বাচ্চারা স্তন্যপায়ী। সুতরাং পানির মৃত কিংবা জীবিত স্তন্যপায়ী প্রাণীও যবেহ না করে খাওয়া হালাল।

اَلسِّرِيُوْلَا এম্বারজেক(Amberjack) (আম্বরজেক নহে) নামক একটি মাছের আরবী শব্দ । এর বৈজ্ঞানিক নাম *Seriola dumerili* যা সৌদি আরবের উপকূলীয় পানিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রজাতিটির সর্বাধিক দৈর্ঘ্য হয় মাত্র ২০০ সেন্টিমিটার এবং এর সর্বাধিক ওজন হয় মাত্র ৭০ কেজি। সুতরাং এটি ৩০০ লোকের আঠার দিনের খাদ্য হতে পারে না। অতএব আম্বর দ্বারা নিশ্চয়ই তিমিকেই বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তিনি তোমাদেরকে যা আদেশ করেন তা মেনে নিতে ও যা নিষেধ করেন তা পরিহার করে চলতে আদেশ করেন। এসব আয়াত দ্বারা মদ, জুয়া, প্রতিমা ও তৎসংশ্লিষ্ট শুভ সংখ্যা ৫, ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহকে এবং ইহরাম অবস্থায় স্থলভাগের শিকার ধরা ও একে হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহর নিকটই হবে সকলের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল ও তাঁকে অমান্য করার কারণে তিনি শাস্তি দিবেন এবং তাঁকে মান্য করার কারণে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

(٤) ﴿وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ؕ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ﴾

অর্থ – তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। জলে (সমুদ্রে) ও স্থলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না তাঁর জ্ঞাতসারে ব্যতীত। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না , কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে (লিখিত) রয়েছে।

(৭-৮নং পারা ঃ সুরা নং ৬ আন্‌আম ঃ রুকু নং ৭ ঃ আয়াত নং ৫৯)।

مَفَاتِحُ শব্দটি বহুবচন।

مِفْتَحُ وَ مِفْتَاحُ উভয়টি এর এক বচন হতে পারে। অর্থ চাবি, চাবিকাটি, সুইচ ইত্যাদি।

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

غَيْبُ শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বুঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু আল্লাহ তা'লা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি -(মাযহারী)।

প্রকৃত গায়েবের দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা ক্বিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণতঃ কে কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার তা ফেলবে, কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিযিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পরিমাণ হবে?

'কোন পাতা ঝরে না তাঁর জ্ঞাতসারে ব্যতীত' অর্থাৎ তিনি নির্জীব বস্তুসহ প্রত্যেক বস্তুর গতি সম্বন্ধে জানেন। সুতরাং জীবন্ত প্রাণীসমূহ যাদের উপর ঐশ্বরিক বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে বিশেষ করে মানুষ ও জ্জীন তাদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান কত হতে পারে?

অপর প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রুণ যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু কারও জানা নেই যে পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী , সৎস্বভাব না বদস্বভাব হবে। আল্ট্রাসনোগ্রাফির (Ultrasonography) মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ করতে পারে কেবল তখনই যখন গর্ভধারণের ১৮-২০ সপ্তাহের মধ্যে লিঙ্গ গঠিত হয়ে যায়।৩ এমনি ধরণের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে ঐগুলোও গায়েবের অন্তর্ভূক্ত। কোরানের পরিভাষায় যাকে "গায়েব" বা অদৃশ্য বলা হয় তা আল্লাহ ছাড়া কারও জানা নেই । পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃত পক্ষে গায়েব নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে গায়েব বলেই অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ পূর্বে যা খালি চোখে দেখত না এখন তা দেখতে পায়। যেমন ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) আবিষ্কার হওয়ার পর মানুষ পূর্বে অদৃশ্য ছিল এমন অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও এখন দেখতে পায়; কিন্তু এসকল ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র বস্তুগুলো গায়েব নয়, এগুলো ছিল, খালি চোখে দেখা যেত না। তেমনিভাবে বহু দূরের বস্তু যেগুলো মানুষ একসময় খালি চোখে দেখত না ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope)আবিষ্কারের পর হতে মানুষ সেগুলো দেখতে পাচ্ছে । ঐসব দূরবর্তী বস্তু গায়েব নয়, বিদ্যমান ছিল, পূর্বে দেখত না, এখন দেখতে পাচ্ছে।

স্থলে ও সমুদ্রে (জলে) যা কিছু আছে তা আল্লাহ তা'লাই ভাল জানেন। মানুষ তার কার্যাবলী ও গবেষণার দ্বারা স্থল ও সমুদ্রের অনেক জ্ঞানই লাভ করেছে এবং করছে। কিন্তু বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে বলতে পারি যে স্থল ও সমুদ্রের বিশাল জ্ঞানভান্ডারের অতি সামান্যই মানুষ এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছে। এ জ্ঞান ভান্ডারের উপর হাজার হাজার বছর গবেষণা করে মানুষ নিজে লাভবান হতে পারবে ও অন্যের কাজেও লাগাতে পারবে। কিন্তু তার পরেও মানুষ আল্লাহর এ অশেষ জ্ঞান ভান্ডারের কিনারা পাবে না । মহাবিজ্ঞানী নিউটনের বলেছেন যে, তিনি জ্ঞানসমূদ্রের কিনারের নূড়ি কুড়াচ্ছেন মাত্র।৪ আল্লাহ কাশফ্ ও এলহামের মাধ্যমে কাউকে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দিতে পারেন। কিন্তু কোরআনের পরিভাষার এটাকেও এলমে গায়েব বলা যায় না। এলমে গায়েবের ভান্ডারের চাবি একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে।

মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে শস্যকণার পতন এবং আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্যের পতন - এ সবই লৌহে মাহফুজে লিখিত রয়েছে। সেই লৌহে মাহফুজের সকল রেকর্ড একমাত্র আল্লাহই জানেন, কারণ তাঁর দ্বারাই অথবা তাঁর হুকুমেই তা লিখিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। সোজা ভাষায়, মহাবিশ্বে বা তারও বাইরে যা কিছু ঘটছে

সবই আল্লাহর জ্ঞাতসারে ঘটছে।

(৫) ﴿ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴾

অর্থ – আপনি (মুহাম্মদ সাঃ) বলুন, "কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের (সমুদ্রের) অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান কর (এ বলে যে) , যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।"

(৭-৮ নং পারা ঃ সুরা নং ৬ আন্‌আমঃ রুকু নং ৮ ঃ আয়াত নং ৬৩)।

স্থল ও জলের অন্ধকার বলতে রাত্রির অন্ধকার হতে পারে অথবা স্থল ও জলের কোনও বিপদ যেমন ঝড় তুফানের সময়ের অন্ধকার হতে পারে। আমরা সাধরণতঃ রাতের অন্ধকারকেই বুঝে থাকি। এ অন্ধকারের বিপদের সময় মানুষ আল্লাহকে বিনীতভাবে ডাকতে থাকে যেন তিনি তাদেরেকে উদ্ধার করেন এবং এ সময় তারা প্রতিজ্ঞা করতে থাকে যে যদি তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন তবে তারা চির কৃতজ্ঞ থাকবে। সে সময় কিন্তু তারা দেবদেবীকে ডাকে না আল্লাহকেই কায়মনোবাক্যে ডাকে। কারণ তারা তখন বুঝতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উদ্ধারকারী নেই। কিন্তু মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ যে, যখনই সে উদ্ধার পেয়ে যায় তখনই বলতে শুরু করে যে সে তার বুদ্ধির জোড়ে অথবা অমুক দেবদেবীর উছিলায় উদ্ধার পেয়েছে।

(٦) ﴿ وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴾

অর্থ – তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন – যাতে তোমরা স্থল ও জলের (সমুদ্রের) অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি।

(৭-৮ নং পারা ঃ সুরা নং ৬ ঃ আনআম ঃ রুকু নং ১২ ঃ আয়াত নং ৯৭)।

GPS (Global positioning system) ও কম্পাসের পূর্বে নক্ষত্রপুঞ্জই ছিল একমাত্র প্রাকৃতিক নৌ চালনের সহায়ক বস্তু (Navigator)| রাত্রে উত্তর গোলার্ধে ধ্রুবনক্ষত্রের (Polaris or North Star) সাহায্যে দিক নির্ণয় করে জাহাজ চালানো হত। উরসা মাইনর (Ursa minor) বা ছোট ভাল্লুক (Little bear) নামক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ধ্রুবনক্ষত্র সব চাইতে উজ্জল এবং একে ছোট ভাল্লুকটির লেজের মধ্যে পাওয়া যায় (চিত্র ২)। নক্ষত্রটি উত্তর মেরুর উপরে অবস্থিত থাকে। তবে আকাশের সকল নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বলতার দিক দিয়ে ধ্রুবনক্ষত্রটির অবস্থান পঞ্চদশে। এর সাহায্যে একবার উত্তর দিক নির্ণয় করতে পারলে সহজেই অন্যান্য দিকগুলি নির্ণয় করা যায়। তাই উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, অন্ধকার রাত্রিতে স্থলে ও জলে চলতে হলে আল্লাহর সৃষ্টি নক্ষত্রসমূহকে দিক নির্ণয়ের জন্য সহজে ব্যবহার করা যায়।

"নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি"- এর অর্থ আমি সেগুলোকে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য করে দিয়েছি সেসকল লোকের জন্য যাদের সুস্থ মন রয়েছে এবং যারা সত্যকে চিনতে ও মিথ্যাকে পরিহার করতে সক্ষম।

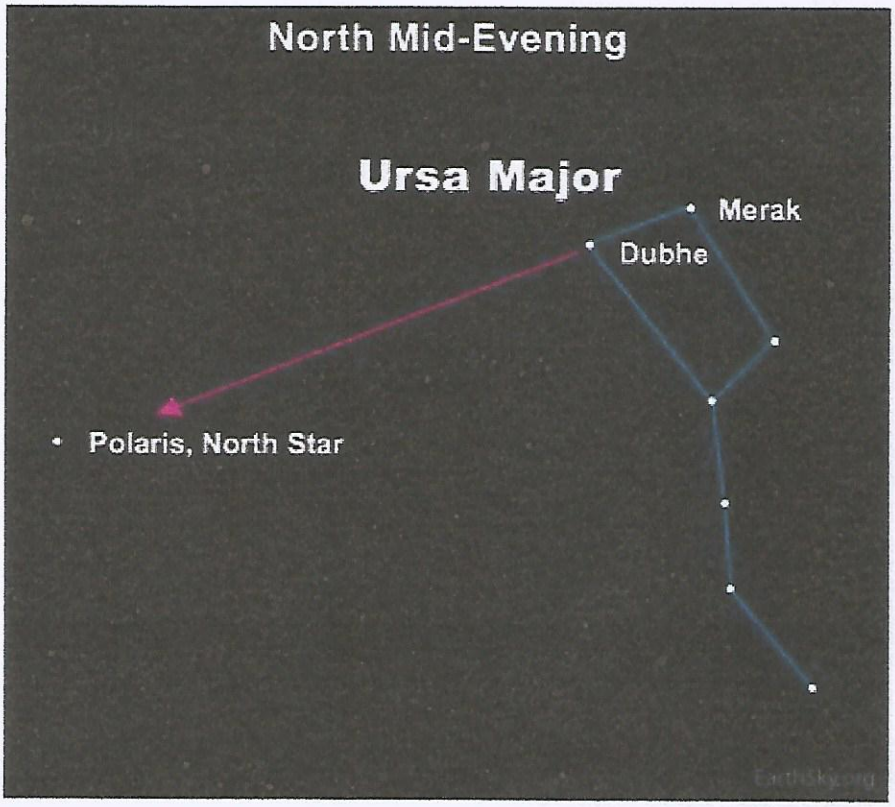

চিত্র নং ২। ধ্রুবনক্ষত্র (Polaris or North Star)

(৭) ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴾

অর্থ – সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম- বস্তুত তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনিহা প্রদর্শন করেছিল।

(৮-৯ নং পারা ঃ সুরা নং ৭ আ'রাফ ঃ রুকু নং ১৬ ঃ আয়াত নং ১৩৬)।

আল্লাহ তা'লার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ঐগুলোর প্রতি অনিহা প্রদর্শন করার কারণে তিনি ফিরআউন ও তাঁর বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফের বাদশাহ ফিরাআউন যখন মুসা (আঃ)কে ধরার জন্য তার সৈন্যবাহিনীসহ বের হয়ে পড়ল তখন আল্লাহ মুসা (আঃ)কে অহি করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেন তার অনুসারীগণকে নিয়ে সমুদ্র পারি দিয়ে অন্য পাড়ে চলে যান এবং এ নিশ্চয়তাও দিলেন যে ফিরাউন কোনভাবেই তাদেরকে ধরতে পারবে না । যখন মুসা (আঃ) রাত্রে বের হয়ে সমুদ্র পাড়ে পৌছে গেলেন তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তিনি সমুদ্রের পানির উপর তার লাঠির দ্বারা আঘাত করলেন। তখন সমুদ্রের পানি বিভক্ত হয়ে বারটি শুকনো রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। মুছা (আঃ) তার বার গোত্রের অনুসারীদেরকে নিয়ে বারটি রাস্তা দিয়ে সহজে সাগরের অন্য পাড়ে চলে গেলেন । ফিরাউন যখন পিছনে ধাওয়া করে সমুদ্রের কিনারে এসে পৌছল তখন এ অদ্ভূদ ঘটনা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল, কিন্তু গর্বভরে তার লোকদেরকে বলল যে, এসব রাস্তা তার হুকুমেই হয়েছে। সুতরাং তারা যেন তার পেছনে পেছনে চলে শুষ্ক রাস্তাসমূহের উপর দিয়ে সাগর পারি দেয় এবং মুসার লোকদেরকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। তারা যখন সকলেই সমুদ্রের ভেতর প্রবেশ করল তখন আল্লাহর হুকুমে রাস্তার দুদিকের পানি একত্র হয়ে গেল এবং সকলেই সমুদ্রে ডুবে মারা গেল। সেটা কোন সমুদ্র ছিল সে

ব্যাপারে তফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে সেটা ছিল ভূমধ্যসাগর এবং কারো কারো মতে সেটা ছিল লোহিত সাগর। ভূমধ্যসাগর হলে মুসা (আ:) মিশর হতে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন। আর লোহিত সাগর হলে তারা পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন। সাগর শুকিয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে যাওয়ার

কোন কোন খ্রীষ্টান বিজ্ঞানী অবশ্য এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কারণ বাইবেলেও সমুদ্র বিভক্ত করার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এরকম একজন বিজ্ঞানী হলেন ডঃ ব্রোস পার্কার। তিনি ছিলেন একজন লেখক এবং নিউ জার্সির স্টিভেন্স ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির ভিজিটিং প্রফেসার যিনি পূর্বে ন্যাশনাল অসেন সার্ভিসের ন্যাশনাল অসিয়ানিক এন্ড এটমোস্ফেরিক (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA's) এর প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তার মতে মুসা (আঃ) এর চন্দ্র ও জোয়ারভাঁটা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল। মুসা (আঃ)এর এ জ্ঞান তাকে সঠিক অনুমান করতে শিখিয়েছিল কখন বণি ইস্রাঈলরা লোহিত সাগরের ভাঁটার সময় সমুদ্রতল শুষ্ক হয়ে গেলে তার উপর দিয়ে সাগর পারি দিতে পারবে। তার নিখুঁত জ্ঞান দ্বারা তিনি সেই সঠিক সময়টিও বুঝতে পেরেছিলেন যখন ফিরআউনবাহিনী সাগর পারি দেয়ার সময় দ্রুত জোয়ার এসে তাদেরকে ডুবিয়ে মারবে। তার মতে এসকল শুষ্ক রাস্তা লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে তৈরী হয়েছিল। তবে এটাও পার্কারের একটা অনুমান বই কিছু নহে। কারণ ভাটার সময় সাগর পারি দিতে পারলে মুসা (আঃ)কে আল্লাহ তা'লা লাঠির আঘাতে সাগরে শুকনো রাস্তা তৈরী করার আদেশ দিতেন না। নবী রসুলদেরকে আল্লাহ তা'লা ওহির মাধমে এমন কিছু জানিয়ে দেন যা সাধারণ লোকের জ্ঞানের অগোচর থাকে। যেমন কোরআনের অন্যত্র মুসা নবীকে আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছিলেন যে "সাগরের মধ্য দিয়ে শুষ্ক রাস্তা নির্মাণ কর, পেছন থেকে এসে তোমাদেরকে ধরে ফেলার ভয় করো না কিংবা সাগরে ডুবে মরার ভয় করো না।" তাই মুসা (আঃ) নিঃশঙ্ক ছিলেন। বণি ইসরাঈলরা যখন সামনে সাগর ও পেছনে ফিরাউনের বিশাল বাহিনী দেখল তখন তারা ধরা পড়ার ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল এবং বলতে লাগল যে তাদেরকে এখন কে বাঁচাবে। মুসা (আঃ) তাদেরকে অভয় দিয়ে বললেন যে, তাদের সাথে আল্লাহ আছেন। হিযরতের পথে কিংবা অন্য যে কোনও বিপদের সময় নবীদের ঈমান কেবল বাড়ে। কারণ তাদের সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেন। সাধারণ লোকদের ঈমান বাড়ে ও কমে। আল্লাহর কোন কুদরত অথবা নবী-রাছুলের কোন মোজেজা দেখলে বেড়ে যায়, না দেখলে সাধরণতঃ কমে যায়। আল্লাহর হুকুমে আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে আখেরী নবী মোহাম্মদ (সাঃ)এর মক্কা হতে মদীনায় হিযরত করার সময়ও আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফলে নবী করিম (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)এর ঈমান বেড়ে গিয়েছিল যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(৮) ﴿ وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰی قَوْمٍ یَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤی اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا یٰمُوْسَی اجْعَلْ لَّنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴾

অর্থ – বস্তুতঃ আমি সমুদ্র পার করে দিয়েছি বনী-ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তি পূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, "হে মুসা ! আমাদের উপাসনার জন্য তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন।" তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে।"

(৮-৯ নং পারা ঃ সুরা নং ৭ আ'রাফ ঃ রুকু নং ১৬ ঃ আয়াত নং ১৩৮)।

আল্লাহ বনী-ইসরাঈলদিগকে সমুদ্র পার করে না দিলে তারা সমুদ্র পার হতে পারত না, কারণ সেখানে পারাপারের কোন ব্যবস্থা (নৌকা কিংবা জাহাজ) ছিল না। ভাঁটার সময় লোহিত সাগরের ভেতর দিয়ে চলাচল করা যেত কিনা জানা যায় নি, কারণ কোরআন কিংবা হাদীছে এরূপ কোন বর্ণনা আসেনি। বরং কোরআন শরীফে বলা আছে যে, আল্লাহ তা'লা মুসা (আঃ)কে সমুদ্রের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করতে আদেশ করেছিলেন। তখন মুসা (আঃ) তার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত করেন, ফলে সমুদ্রের ভেতর দিয়ে শুষ্ক রাস্তা তৈরী হয়ে গিয়েছিল ; সে সকল রাস্তায় বনিইসরাঈলরা সাগর পারি দেয়। এর

দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সেটা একটা অলৌকিক ব্যাপার ছিল। ভাঁটার সময় সমুদ্র পারি দিতে পারলে লাঠির দ্বারা আঘাত করার কি প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া মুসা (আঃ)এর যদি লোহিত সাগরের জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে এতই সঠিক জ্ঞান থাকত যে, তিনি পার হয়ে যেতে পারবেন কিন্তু ফিরআউনের লোকজন তা পার হতে সময় পাবে না, জোয়ার এসে যাবে, তবে ফিরআউন কেন তার বাহিনীকে আদেশ করল সাগর পারি দিতে। ফিরআউনের বাহিনীতে কি এমন কোন লোক ছিল না যে লোহিত সাগরের জোয়ারভাঁটা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে ? ফিরআউন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে, সেটা একটা অলৌকিক ব্যাপার, কিন্তু সে তার বাহিনীকে সেটা বুঝতে দেয় নি। তার হয়ত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, সেসকল রাস্তা চিরস্থায়ী গেছে এবং সে সহজেই সেগুলো দিয়ে সাগর পারি দিতে পারবে। সেজন্যই সে তার বাহিনীকে আশ্বস্ত করার জন্য গর্বভরে বলতে পেরেছিল যে, সেসকল রাস্তা তারই হুকুমে তৈরী হয়েছিল। আয়াতের পরবর্তী বাক্যগুলি হতে বুঝা যায় যে বনিইসরাঈলরা আসলে এক আল্লাহ বিশ্বাস করত না, তাদের ভিতর তখনও কুফুরি ছিল, নতুবা লাঠির আঘাতে সাগর শুকিয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে যাওয়ার মত এমন অলৌকিক ঘটনা দর্শন করার পরও কেমনে তারা পূজার জন্য মুসাকে মূর্তি তৈরী করে দিতে বলতে পারে। বাহ্যিকভাবে তারা ইমান আনলেও অজ্ঞতার কারণে তাদের অন্তরে মূর্তিপূজা দৃঢ়বদ্ধমূল ছিল অথবা তারা মুসা (আঃ)এর মোজেজার উপর বিশ্বাস করত কিন্তু নিরাকার এক আল্লাহর উপর নয়।

(৯) ﴿ وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴾

অর্থ - আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন (হে মুহাম্মদ সাঃ) যা ছিল সাগর তীরে অবস্থিত। যখন তারা শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান।

(৮-৯ নং পারা ঃ সুরা নং ৭ আ'রাফ ঃ রুকু নং ২১ ঃ আয়াত নং ১৬৩)।

প্রত্যেক জাতির (উম্মাহর) জন্য সপ্তাহের একটি নির্ধারিত দিন রয়েছে যেদিন তারা একত্র হয়ে প্রার্থনা করবে।৫ আল্লাহ তা'লা মুসা নবীর মাধ্যমে বনি-ইসরাঈলদের জন্য শুক্রবার নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন কিন্তু তারা সেটাকে পরিবর্তন করে শনিবারকে বেছে নিল, কারণ আল্লাহ তা'লা এ দিনে কোন কিছু সৃষ্টি করেন নাই, যেহেতু তিনি শুক্রবারেই তাঁর সৃষ্টি সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তা'লা তৌরাতের বিধান অনুসারে তাদের জন্য শনিবার পালনকে বাধ্যতামূলক করে দিলেন এবং বলে দিলেন যেন তারা তা পালন করে । একই সময় এও বলে দিলেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রেরিত হবেন তখন তারা যেন তাকে অনুসরণ করে এবং সে ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তারা শনিবারের পবিত্রতা রক্ষা করবে কিন্তু তারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করে আল্লাহর অবাধ্যতা করল, তখন আল্লাহ তাদের শাস্তি দিলেন। তারা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে শনিবারের আগের দিন সাগরে জাল ও দড়ি পাতা এবং পানির কৃত্তিম ক্ষুদ্র জলাশয় খনন করা ইত্যাদি প্রবঞ্চনাপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে শনিবারকে অসম্মান করতে লাগল। স্বাভাবিকভাবে শনিবারে বিরামের কারণে যখন প্রচুর মাছ আসতে লাগল তখন মাছগুলো জাল ও দড়িতে ধরা পড়তে লাগল। শনিবার শেষে রাত্রিবেলায় ইহুদীরা মাছগুলো সংগ্রহ করত। যখন সেই জনপদের ইহুদীরা সেটা করতে লাগল তখন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে মানুষের প্রায় অবিকল চেহারার বানরে রূপান্তরিত করে দিলেন -(ইবনে কাছীর)।

প্রথম দিকে যখন বনি-ইসরাঈলরা শনিবারের পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে লাগল তখন প্রতি শনিবার সেই জনপদ সংলগ্ন সাগর মাছের জন্য একটি

অভয়াশ্রমে (Sanctuary) পরিণত হয়ে গেল । বিজ্ঞানের পরিভাষায় মাছের অভয়াশ্রম বলতে মাছ রক্ষার্থে পানিতে এমন একটি বিশেষ স্থায়ী আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করাকে বুঝায় যেখানে মাছ স্বাভাবিকভাবে প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। অন্য কথায়, মৎস অভয়াশ্রম একটি সীমানা-নির্দ্দিষ্ট সংরক্ষিত এলাকা যেখানে লক্ষ্যিত মাছকে বিরক্ত বা ধরা যাবে না। জলজ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে মৎস-ভান্ডার(Fish stock), জৈববৈচিত্র (Biodiversity) এবং আবাস (Habitat) কার্যকরীভাবে সংরক্ষণ (Conservation) করা যায়। আয়াতে উল্লিখিত জনপদ সংলগ্ন সাগর মাছের জন্য এমনি একটি অস্থায়ী অভয়াশ্রমে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অস্থায়ী এজন্য যে, সেখানে শুধু মাত্র শনিবার মাছ ধরা বন্ধ থাকত। তাই শনিবারে সেখানে মাছসমূহ শর্তযুক্তভাবে প্রতিফলিত (Conditioned reflex) হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানের পরিভাষায় শর্তযুক্ত প্রতিফলিত (Conditioned reflex) বলতে এমন কোন কাজ কিংবা অনুভূতিকে বুঝায় যা কেউ করতে বা অনুভব করতে শিখতে পারে কোন বিশেষ অবস্থা (Situation) অথবা উদ্দীপক বস্তুর (Stimulus) প্রতিক্রিয়ায় (Response)। ফলে একাধারে অনেক শনিবার মাছ না ধরার কারণে মাছেরা শনিবারকে ধৃত কিংবা বিরক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ অনুভব করতে লাগল এবং দলে দলে সেখানে এসে জড় হত ও স্বাধীনভাবে ভেসে বেড়াত। এরূপে যে কোন প্রাণী যে স্থানকে তাদের জন্য নিরাপদ মনে করে এবং সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও পানীয় পায় বসবাসের জন্য তারা সাধারনতঃ সে স্থানকে বেছে নেয় অথবা অনিরাপদ এবং খাদ্য ও পানীয়ের অভাবগ্রস্থ এলাকা থেকে সে স্থানে অভিপ্রয়ান করে (Migrate) চলে আসে। সাগরের যে অংশে বনিইসরাঈলদের প্রভাব ছিল সেখানে তারা প্রথম দিকে শনিবারে মাছ ধরা বন্ধ রাখে। তাদের প্রভাবাধীন এলাকার বাইরে নিশ্চয়ই অন্য জাতির লোকেরা শনিবারেও মাছ ধরত। ফলে তাড়া খেয়ে ঐদিন নিরাপত্তার জন্য ঐ এলাকার মাছসমূহ বনিইসরাঈরদের প্রভাবাধীন এলাকায় এসে ভীড় জমাত এবং এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'লা শনিবারে সাগরে মাছের প্রাচুর্যময় সমাগম দেখিয়ে বনি-ইসরাঈলরা লোভ সামলিয়ে শনিবারের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আয়াতে উল্লিখিত সাগর তীরের বনি-ইসরাঈলগণ যখন শনিবার দিন সাগরে মাছের এমন প্রাচুর্য দেখতে পেল তখন তারা লোভ সামলাতে পারেনি। তখন তাদের মধ্যে অবাধ্যরা আল্লাহ ও তাঁর নবীর নিষেধ সত্ত্বেও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে মাছ শিকার করতে লাগল, ফলে তারা আল্লাহ কর্তৃক দন্ডিত হল অর্থাৎ বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। মানুষ হতে কিরূপে বানরে রূপান্তরিত হল তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এটাও একটা অলৌকিক ঘটনা। যে আল্লাহ মানুষকে মায়ের পেটে সুন্দর আকৃতি প্রদান করতে পারেন তিনি তাকে বিকৃতও করতে পারেন। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সুশ্রী মানুষটিকে কি তিনি তার বার্ধক্যে শ্রীহীন করে দেন না ?

(١٠) ﴿ هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ط حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَآئَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴾

অর্থ – তিনি তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমন করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলো তাদেরকে (আরোহীদেরকে) নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলো বাত্যাহত এবং সর্বদিক হতে তরঙ্গাহত হয় এবং তারা ওদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে তখন তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ডেকে বলে, "তুমি আমাদেরকে এ হতে ত্রান করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হব ।"
(১১ নং পারা ঃ সুরা নং ১০ ইউনুস ঃ রুকু নং ৩ ঃ আয়াত নং ২২)।

স্থলে ও সমুদ্রে আল্লাহই ভ্রমন করান এবং এর সক্ষমতা তিনিই দান করেন। আমরা জেনেছি যে, নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে মানুষ, পশু কিংবা কোন

যানবাহন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার এ বৈজ্ঞনিক সূত্র আবিষ্কার হওয়ার হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই প্রাণী ও যানবাহন সামনের দিকে এগুত। আমরা আরো জেনেছি জলে নৌকা কিংবা অন্যান্য জাহাজ আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে ভাসমান হয়। এটারও আবিষ্কারের হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি পানিতে ভাসত । নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি অনুকূল বায়ুতে দাড়, পাল কিংবা ইঞ্জিনের সাহায্যে বয়ে যায় সেই নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারেই অর্থাৎ যে শক্তিতে কোন বস্তু পিছনে ঠেলে সেই একই শক্তিতে সেটা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। স্থলেও একই নিয়মে কোন বস্তু কিংবা প্রাণী সামনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রাণী যে শক্তিতে পিছন দিকে পা ঠেলে সে একই শক্তিতে বিপরীত দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে অগ্রসর হয়। যানবাহনের পিষ্টন পিছন দিকে ঠেললে গাড়ী সমান শক্তিতে সামনের দিকে অগ্রসর হয় যে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সহজে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারলে সবাই আনন্দিত হয় যেরূপ কোন আরোহী হয়ে থাকে। কিন্তু ভীষণ ঝড় [যেমন উষ্ণমন্ডলীয় সাইক্লোন ঘন্টায় ৪০৮ কিমি (ঘন্টায় ২৫৩ মাইল) পর্যন্ত উঠতে পারে] কিংবা বিশাল তরঙ্গের (যেমন ৬২ ফিট বা ৬ তালা বিল্ডিংএর সমান উচ্চতার তরঙ্গের) আঘাতে সামনে অগ্রসর হতে বাধা প্রাপ্ত হলে অথবা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে তখন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয় এবং সে দেবদেবী বাদ দিয়ে খাঁটি দিলে একমাত্র আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করতে থাকে যেন তিনি তাকে উদ্ধার করেন এবং সাথে এ ওয়াদাও করতে থাকে যে, উদ্ধার প্রাপ্ত হলে আল্লাহর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় এবং আবার অকৃতজ্ঞ হয় ও পুনরায় দেবদেবীর পূজায় লিপ্ত হয়।

(১১) ﴿ وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴾

অর্থ - আর আমি বনি-ইসরাঈলকে পার করে দিয়েছি সাগর। তারপর তাদের পশ্চদ্ধাবন করেছে ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন সে বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনিইসরাঈলরা। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত।

(১১ নং পারা ঃ সুরা নং ১০ ইউনুস ঃ রুকু নং ৯ ঃ আয়াত নং ৯০)।

মুসা (আঃ)কে সদলবলে সমুদ্র পার করে দেয়ার ঘটনাটি ইতিপূর্বে সুরা আ'রাফের ১৩৮ নং আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বনি-ইসরাঈলদিগকে সমুদ্র পার করে না দিলে তারা সমুদ্র পার হতে পারত না, কারণ সেখানে পারাপারের কোন ব্যবস্থা (নৌকা কিংবা জাহাজ) ছিল না। ভাঁটার সময় লোহিত সাগরের ভিতর দিয়ে চলাচল করা যেত কিনা জানা যায়নি, কারণ কোরআন কিংবা হাদীছে এরূপ কোন বর্ণনা আসেনি। বরং কোরআন শরীফে বলা আছে যে, আল্লাহ তা'লা মুসা (আঃ)কে সমুদ্রের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করতে আদেশ করেছিলেন। তখন মুসা (আঃ) তার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত করেন, ফলে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে শুষ্ক রাস্তা তৈরী হয়ে গিয়েছিল ; সে সকল রাস্তায় বনিইসরাঈলরা সাগর পারি দেয়। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সেটা একটা অলৌকিক ব্যাপার ছিল। ভাঁটার সময় সমুদ্র পারি দিতে পারলে লাঠির দ্বারা আঘাত করার কি প্রয়োজন ছিল ? তাছাড়া মুসা (আঃ) এর যদি লোহিত সাগরের জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে এতই সঠিক জ্ঞান থাকত যে তিনি পার হয়ে যেতে পারবেন কিন্তু ফিরআউনের লোকজন তা পার হতে সময় পাবে না, জোয়ার এসে যাবে, তবে ফিরআউন কেন তার বাহিনীকে আদেশ করল সাগর পারি দিতে ? ফিরআউনের বাহিনীতে কি এমন কোন লোক ছিল না যে লোহিত সাগরের জোয়ারভাঁটা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে ? এসব ব্যাপারে ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে। ফিরআউন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে, সেটা একটা অলৌকিক ব্যাপার, কিন্তু সে তার বাহিনীকে সেটা বুঝতে দেয় নি। তার হয়ত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, সেসকল রাস্তা চিরস্থায়ী হয়ে গেছে এবং সে

সহজেই সেগুলো দিয়ে সাগর পারি দিতে পারবে। সেজন্যই সে তার বাহিনীকে আশ্বস্ত করার জন্য গর্বভরে বলতে পেরেছিল যে, সেসকল রাস্তা তারই হুকুমে তৈরী হয়েছিল। তাই সে তার সেনাবাহিনীকে মুসা (আঃ) ও তার লোকজনকে পাকড়াও ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দ্রুত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে আদেশ করেছিল। কিন্তু তার অনুমান ঠিক হয় নি, রাস্তাসমূহের দুপাশের পানি এসে একত্র হয়ে গেল এবং যখন সে ও তার বাহিনী ডুবতে আরম্ভ করল তখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বনি ইসরাঈলরা যাঁর উপর ঈমান এনেছে সে আল্লাহই একমাত্র উপাসনার অধিকারী, তিনি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই এবং একমাত্র তিনিই তাকে উদ্ধার করতে পারেন। তাই সে তখন আল্লাহর উপর ঈমান আনল এ আশায় যে আল্লাহ হয়ত তাকে বাঁচাবেন অথবা বাঁচার জন্য চাতুরী করে ঈমান এনেছিল, আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু সেটা অনেক দেরী হয়ে গেয়েছিল এবং তারা সকলে সাগরে ডুবে মরেছিল। অতি চতুর, অহঙ্কারী ও বাড়াবাড়িকারীদের যে এটাই স্বাভাবিক পরিণতি, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সে শিক্ষাই দিচ্ছেন।

(১২) ﴿ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴾

অর্থ – তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং জাহাজকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন যাতে সেগুলো তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করতে পারে এবং নদ-নদীকেও তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন।

(১৩ নং পারা ঃ সুরা নং ১৪ ইব্রাহীম ঃ রুকু নং ৫ ঃ আয়াত নং ৩২)।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এখানে আসমানসমূহ বলা হয়েছে । কোরআন শরীফে যেখানে আসমানের কথা বলা হয়েছে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আসমানসমূহ বলা হয়েছে। আসমান বলতে আমরা যে আসমান দেখি সেটা ত একটি মাত্র আসমান। তবে এখানে আসমানের বহুবচন কেন বলা হল? তবে কি আরও আসমান রয়েছে ? এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে সুরা বাক্বারার ১৬৪ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে।

উত্তাপের ফলে পানি বাষ্পিভূত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং পরে বৃষ্টির মাধ্যমে আবার পানিরূপে যমীনে পতিত হয়। একে পানিচক্র বলে এবং এটাও ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। জলীয় বাষ্প ঘনিভূত হয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়ে মেঘমালা সৃষ্টি করে। এসকল মেঘমালা বৃষ্টি অথবা তুষার বা বরফরূপে তাদের পানি হারায়। এ পদ্ধতিকে অধঃক্ষেপণ বা নিম্নাভিমুখে নিক্ষেপণ (Precipitation) বলা হয়। বৃষ্টির পানি যমীনে পতিত হয়ে যমীনকে সিক্ত করে ও বীজ হতে অঙ্কুরদ্গম করে (Germinate)। অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে গাছে বা বৃক্ষে পরিণত হয় যাতে পরে ফুল, ফল ও শস্য ধরে। আমরা ফল ও শস্য রিযিকরূপে আহার করে জীবন ধারণ করি।

সমুদ্রে জলযানসমূহ (কিংবা যেকোন বস্তু) যে ভেসে থাকে আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী এবং এরা যে সামনের দিকে চলে নিউটনের ৩য় সূত্রানুসারে তার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে । কিন্তু এ সূত্রদ্বয় কাজ করে আল্লাহর আদেশেই।

মানুষ সমুদ্রে নৌকা, স্টিমার, জাহাজ ইত্যাদি চালিয়ে পারপার করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে এবং নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করছে। নৌকা জাহাজ ইত্যাদিতে চড়ে মানুষ সমুদ্র হতে শৈবাল, মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য খাদ্য আহরণ করছে এবং সমুদ্র হতে খনিজ সংগ্রহ করছে। মানুষ যুগ যুগ ধরে নদীর পানি পান করছে, চাষাবাদ করছে ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করছে। নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির সাহায্যে নদ-নদী পার হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে এবং নদ-নদী হতে চিংড়ি, মাছ ও অন্যান্য জৈব খাদ্য আহরণ করছে। নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে। নদী হতে বালু, নুড়িপাথর, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সংগ্রহ করছে। এভাবে আল্লাহ জাহাজ ও নদ-নদীকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে তার বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছেন।

(১৩) ﴿ وَ هُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾

অর্থ – তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখ এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার করতে পার।

(১৪ নং পারা ঃ সুরা নং ১৪ নাহ্‌ল ঃ রুকু নং ২ ঃ আয়াত নং ১৪)।

আল্লাহ তা'লা সমুদ্রকে মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে থাকেন। সমুদ্রের পানি হতে লবণ তৈরী হয়। লবণাক্ততা দূর করে মানুষ সমুদ্রের পানিকে সুপেয় পানিরূপে পান করে। এছাড়া সমুদ্রের পানিতে অনেক রকম খনিজ পদার্থ রয়েছে যা মানুষ কাজে লাগাতে পারে। সমুদ্রতলে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম রয়েছে যা মানুষ আহরণ করে কাজে লাগাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ ও স্রোত হতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সমুদ্রে নৌকা ও জাহাজ চলাচল করে। সমুদ্রের বায়ু দ্বারা টারবাইন ঘুরিয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের পানিতে উৎপন্ন শৈবাল হতে খাদ্য ও ঔষধ প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের পানি মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীর পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। মাৎস্য জাতীয় (Fisheries) প্রাণীর মধ্যে অমেরুদন্ডী ও মেরুদন্ডীয় প্রাণী রয়েছে। অমেরুদন্ডীয় প্রাণীর মধ্যে মোলাস্কাজাতীয় প্রাণী [যেমন - ক্লেমস (Clams),সি স্নেইলস (Sea snails) এবং স্কুইড্‌স (Squids) ইত্যাদি], ইকাইনোডার্মেটাজাতীয় (Echinodermata) প্রাণী [যেমন - সি কিউকাম্বার (Sea cucumber), সি আরসিন (Sea urchin) ইত্যাদি] এবং ক্রাস্টাসিয়াজাতীয় (Crustacea) প্রাণী [যেমন- বিভিন্নধরণের চিংড়ি (Prawns and Shrimps), লব্‌স্টার (Lobsters), কাঁকড়া (Crabs) ইত্যাদি] খাদ্যরূপে আহরিত হয়। এছাড়া সমুদ্রের মধ্যে ঝিনুকজাতীয় (Bivalvia)অমেরুদন্ডীয় মোলাস্কা জাতীয় প্রাণীতে বিভিন্ন ধরণের মণিমুক্তা উৎপন্ন হয় যেগুলো মানুষ যুগ যুগ ধরে সংগ্রহ করে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের সরিসৃপজাতীয় প্রাণী [যেমন– কচ্ছপ(Tortoise), কুমীর (Crocodile) ও সাপ (Snake)], সামুদ্রিক পাখী [যেমন- গাঙ্গ চিল (Gulls), পফিন (Puffins) ও পেট্রেল (Petrel)] এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী [যেমন – শুশুক (Porpoise), ডলফিন (Dolphin) ও তিমি (Whale)] মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রে জলযান (কিংবা যেকোন বস্তু) যে ভেসে থাকে আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী এবং এরা যে চলে নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী তার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে।

প্রাচীনকালে জলযান ব্যবহৃত হত নদী , জলাধার ইত্যাদি পারাপার, মৎস, মুক্তা ইত্যাদি আহরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। প্রাচীন রোমীয়গণ, মধ্যযুগীয় রোমীয়গণ, মুসলিম আরবগণ, ইউরোপীয় ও আফ্রীকীয়গণ অন্যান্য বাবহারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেও জলযান ব্যবহার করেছেন। এমনকি আমেরিকা, অস্ট্রেলীয়া ইত্যাদি মহাদেশে আগেও মানুষ ছিল । তারা নিশ্চয়ই সাগর পারি দিয়ে সেখানে পৌছেছিলেন। জাহাজের সাহয্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে মানূষ জীবিকা অন্বেষণ করছে, যুদ্ধ করে জীবিকা ও দেশ দখল করে নিজের প্রভাব বিস্তার করছে , ধর্ম প্রচার করছে, নিজের ভাব ও কৃষ্টি বিনিময় করছে, সমুদ্র হতে খাদ্য ও খনিজদ্রব্য আহরণ করছে, মাৎসজাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর চাষ বৃদ্ধি করছে এবং গবেষণা করে সমুদ্র সম্পদের আহরণ ও উৎকর্ষ সাধন করছে। এভাবে বিভিন্নরূপে মানুষ উপকৃত হয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছে।

(১৪) ﴿ رَبُّكُمُ الَّذِیْ یُزْجِیْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِیْمًا ﴾

অর্থ - তোমাদের প্রতিপালক এমন যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে জলযান চালাইয়া থাকেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (প্রদত্ত রিযিক) অন্বেষণ করতে পার ; নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের অবস্থার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহশীল।

(১৫ নং পারা ঃ সুরা নং ১৭ বণি ইসরাইল ঃ রুকু নং ৭ ঃ আয়াত নং ৬৬) ।

সমুদ্রে জলযান (কিংবা যেকোন বস্তু) যে ভেসে থাকে আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী এবং এরা যে চলে নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী তা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সমুদ্র হতে মানুষ কি কি উপকারিতা লাভ করতে পারে তা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে মানুষ স্থলভাগের তিন গুণ বড় জলভাগ ব্যবহার করেও যে তার প্রয়োজন মিটিয়ে তার অবস্থার উন্নতি করতে পারে আয়াতের শেষাংশে সে কথাই বলা হয়েছে এবং এভাবে আল্লাহ সমুদ্রের বিপুল সম্ভাবনার কথা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(١٥)﴿ وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا﴾

অর্থ - আর যখন সমুদ্রে তোমাদিগকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তখন আল্লাহ ভিন্ন আর যাদেরকে তোমরা উপাসনা করে থাক তারা সবই অন্তর্হিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে রক্ষা করে স্থলভাগের দিকে নিয়ে আসেন তখন তোমরা পুনরায় মুখ ফিরাতে আরম্ভ কর। বস্তুত মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

(১৫ নং পারা ঃ সুরা নং ১৭ বণি ইসরাইল ঃ রুকু নং ৭ ঃ আয়াত নং ৬৭)।

মানুষ সমুদ্রে যায় সাধারণতঃ সাত কারণে ঃ ১) পারপার করতে, ২) ব্যবসাবাণিজ্য করতে, ৩) মাছ ধরতে, ৪) যুদ্ধবিগ্রহ করতে, ৫) পালিয়ে দেশান্তরিত হতে, ৬) প্রমোদ ভ্রমণ করতে কিংবা ৭) কোন আবিস্কারের নেশায়। ইঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ সাধারণতঃ দাঁড় ও পালের সাহায্যে নৌকা বা জাহাজ চালাত। কিনার থেকে দড়ি টেনে টেনেও কিনারের সমান্তরালে নৌকা কিংবা জাহাজ উজান দিকে নিয়ে যেত। কিন্তু ইঞ্জিন আবিস্কারের পর ছোট-বড় প্রায় সব নৌকা ও জাহাজ ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে যদিও কোন কোন অনুন্নত দেশে এখনও দাঁড় ও পালের ব্যবহার রয়ে গেছে। ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে এখন নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি জলযানের গতি অনেক বেড়েছে এবং সমুদ্রে বিপদাপদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

সমুদ্রে প্রধানতঃ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে মানুষ বিপদগ্রস্ত হত এবং এখনও তাই হয় । অতীতে দিক হারা হয়ে মানুষ বিপদে পড়ত। কিন্তু এখন বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার মানুষকে বিপদাপদ হতে রক্ষা করছে।

ভ ভয়ঙ্কর বিপদাপদের মধ্যে প্রধানতঃ সাইক্লোন, সুনামী , জোয়ার ইত্যাদি অন্যতম ।৭ তা ছাড়া ১) উপকূলে আছড়ে পড়া ঢেউ (Shorebreaks), ২) উপকূল হতে সমুদ্রের দিকে শক্তিশালী দ্রুতগামী নালা স্রোত (Rip currents) (চিত্র ৩), ৩) বিদ্যুৎচমক (Lightning) (চিত্র ৪), ৪) উত্তাপ ও সূর্য-দহন (Heat and sunburn), ৫) পানির গুণাগুণ (Water quality), ৬) সামুদ্রিক ভগ্নাবশেষ (Marine debris), ৭) ক্ষতিকর শৈবালের চরম উৎকর্ষতা (Harmful algal blooms), ৮) জেলিফিশ (Jellyfish), ৯) অগ্নি প্রবাল (Fire coral) , ১০) অক্টোপাস, ১১) শিকারী ও বিষাক্ত মাছ (Hunter and poisonous fishes) - (ক) হাঙ্গর (Sharks), খ) তড়িৎ উৎপাদী রে মাছ (Electric ray fish), গ) অন্যান্য বিষাক্ত মাছ, ১২) বিষাক্ত সাপ (Poisonous snakes), ১৩) কুমীর (Crocodiles) ইত্যাদিও বিপদাপদসমূহের অন্যতম।

পূর্বে সাইক্লোন ঝড়ে সামুদ্রিক জাহাজ ডুবে যেত। এখনও সাইক্লোনে আধুনিক দৃঢ়তম জাহাজেরও ক্ষয়ক্ষতি হয় তবে সাধারণঃ ডুবে না কারণ ইহা একটি বলের মত ঢেউয়ের সাথে সাথে উঠানামা করে। আগের দিনে জাহাজ ডুবে গেলে উদ্ধারকারী জাহাজ ছিল না। এখন সিগনাল দিলে উদ্ধারকারী জাহাজ গিয়ে উদ্ধার করে আনতে পারে অথবা এম্পিবিয়াস হেলিকপ্টার গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে। তারপরেও বিশাল বিশাল ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে যেতে পারে। তখন অন্য কোন উপায় না দেখে ডুবন্ত মানুষ বাঁচার জন্য একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, কারণ তারা জানে এ মুহূর্তে তাদের

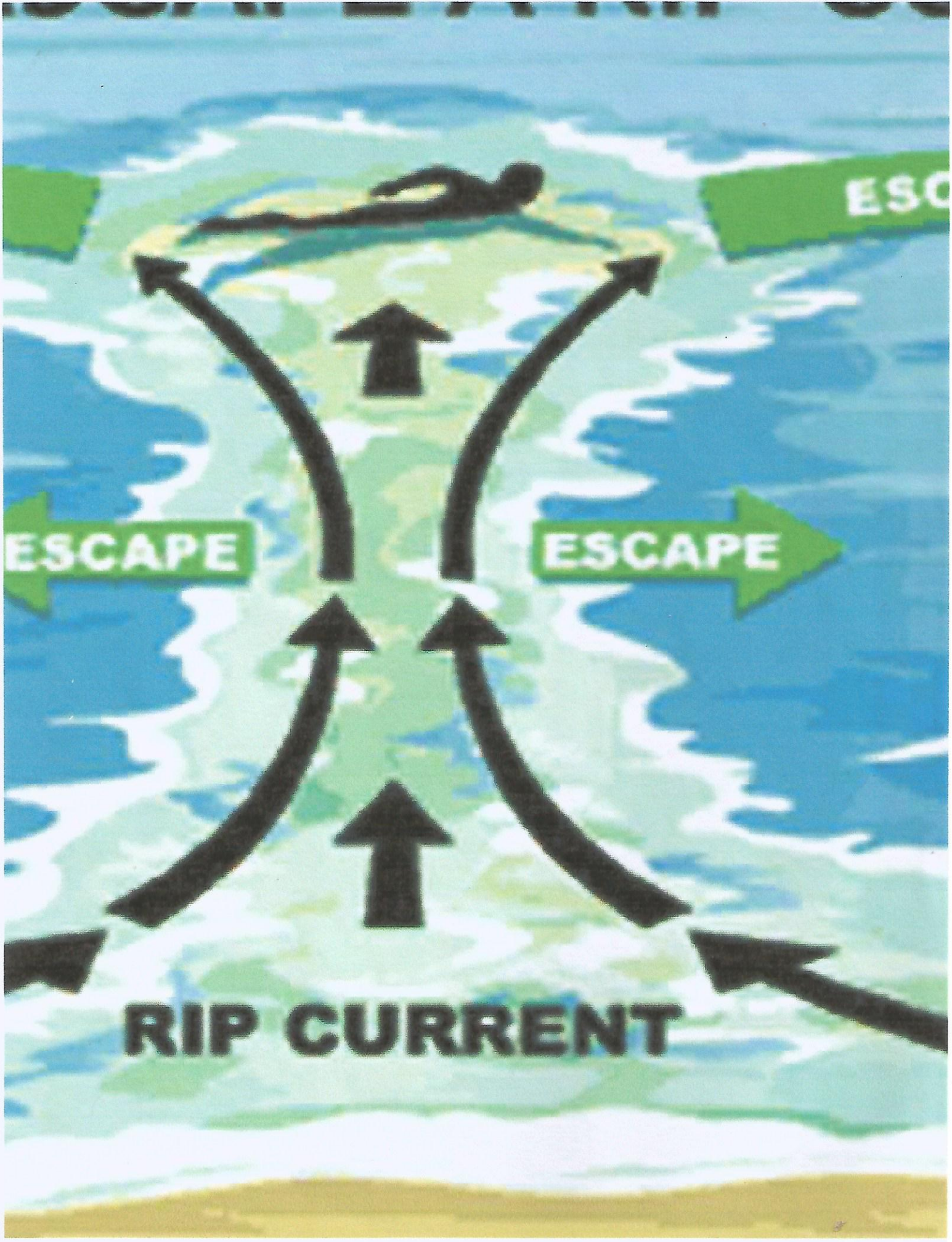
ESC
ESCAPE
ESCAPE
RIP CURRENT

(পূর্বের পৃষ্ঠার) চিত্র নং ৩। দ্রুতগামী নালা স্রোত (Rip currents)।

দেবদেবীদের করণীয় কিছুই নেই। তখন যদি আল্লাহ কোন না কোন উছিলায় ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তখন মানুষ আবার আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাদের মনগড়া দেবদেবীর পূজায় মত্ত হয়।। এ আয়াতে আল্লাহ সে কথাই মানুষকে বলছেন এবং তাকে অতি অকৃতজ্ঞ বলে তিরস্কার করছেন। কোরআন শরীফের অন্যান্য আয়াতেও আল্লাহ মানুষকে অকৃতজ্ঞ বলেছেন।

সুনামী এক প্রকার বৃহদাকার মহাসাগরীয় ঢেউ যা মহাসাগরীয় তলদেশে আচমকা অবস্থানের পরিবর্তন বা গতির কারণে সংঘটিত হয়। হঠাৎ অবস্থানের পরিবর্তন বা গতি কোনও ভূমিকম্প, উচ্চশক্তিসম্পন্ন আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ অথবা পানির নীচে ভূমিধ্বসও হতে পারে। বিশালাকার উল্কাপিন্ডের সংঘর্ষণ বা আঘাতের কারণেও সুনামী হতে পারে। সুনামীসমূহ উন্মুক্ত মহাসাগরের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চ গতিতে ধাবিত হয়ে তটরেখার অগভীর পানিতে ৩০.৬১ মিটার (১০০ ফিট) পর্যন্ত উচ্চতার মারাত্মক ঢেউয়ের রূপ নিতে পারে। সুনামীর কারণে মহাসমুদ্রে বড় বড় জাহাজ ডুবে যায় অথবা উপকূলে আচড়ে পড়ে ভেঙ্গে যায়। উপকূল অঞ্চল ডুবে গিয়ে মানুষ, বাড়ী ঘর, বৃক্ষলতা, গবাদিপশু সবই ভেসে যায়। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের সুনামীর ফলাফল আমরা জানি যাতে ২৩০০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল। এ সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। মানুষ আল্লাহর শরীক করে যেসকল দেবদেবী বানায় ঐগুলোও তখন ভেঙ্গে ছুড়ে পানিতে ভেসে যায়।

জলোচ্ছাস (Tidal bore) হলো জোয়ারভাঁটা সম্বন্ধীয় এক দৃশ্য যাহাতে আগমনরত জোয়ারের পুরোভাগ একটি পানির দেয়াল (বা ঢেউ বা ঢেউসমূহ) গঠন করে যা কোন নদী অথবা সরু উপসাগরের স্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। জলোচ্ছাস শুধু জোয়ারের সময় সংঘটিত হয়, কখনও ভাঁটার সময় হয় না। কোন নদী যে উপকূলে গিয়ে শেষ হয় জলোচ্ছাস সে উপকূল বরাবর সংঘটিত হয়। জলোচ্ছাস এক প্রকার শক্তিশালী জোয়ার যা কোনও নদীতে স্রোতের প্রতিকূলে ঠেলে উঠে পড়ে। জলোচ্ছাস প্রকৃতপক্ষে জোয়ারের ঢেউ। জলোচ্ছাসের ঢেউ গর্জন করতে করতে উপকূলের দিকে গড়াতে থাকে, তখন উপকূলে বিশাল ফেনারাশি সঞ্চিত হয়। চীনের কিয়ানটাং জলোচ্ছাস ৩০ ফিট (৯.২ মি) উচ্চ হয় এবং ঘন্টায় ২০ মাইল (৩২.২ কি) এর অধিক গতিতে চলতে পারে।৮ আলাস্কার বৃহত্তম জলোচ্ছাস ঠিক নঙ্গর স্থানের বাইরে টুর্ণাগেইন সমুদ্র শাখায় সংঘটিত হয়। ইহা ১০ ফিট (৩.১ মি) পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং ঘন্টায় প্রায় ১৫ মাইল (২৪.১৫ কি) গতিতে চলে। এসব দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জলোচ্ছাসের এসব দৃশ্য অবলোকন করে আনন্দ উপভোগ করে।

আগেই বলেছি জলোচ্ছাস আসলে পানির একটি বড় ঢেউ বা স্ফীতি (Surge) যা জলের গভীরতায় হঠাৎ এক পরিবর্তন ঘটায়। যখন কোন নালা (Canal) হঠাৎ গভীর হয়ে যায় তখন এর স্ফীতিকে ধনাত্মক স্ফীতি বলে, আর যখন কোন নালা হঠাৎ অগভীর হয়ে যায় তখন এর স্ফীতিকে ঋণাত্মক স্ফীতি বলে। জলোচ্ছাসও ধনাত্মক স্ফীতি। যে নদীতে জলোচ্ছাস হয় তার অবশ্যই একটি সরু নির্গমণপথ (নালা) থাকতে হবে যাহার মাধ্যমে নদীটি সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়। নদীর শেষাংশ বা মোহনাটি অবশ্যই প্রশস্ত ও সমতল হতে হবে। উপকূলের জোয়ারের পরিসর (Range) অর্থাৎ উচ্চ জোয়ার ও নিম্ন জোয়ারের মধ্যবর্তী জায়গাটি অবশ্যই যথেষ্ট বড় হতে হবে, সাধারণতঃ কমপক্ষে ৬ মিটার (প্রায় ২০ ফিট) হতেই হবে। যখন কোন উপকূল এসকল শর্ত পূরণ করতে পারে তখনই সে উপকূলে জলোচ্ছাস হতে পারে। জলোচ্ছসের সময় বিশাল বিশাল ঢেউ স্বাভাবিক জাহাজ চলাচল ব্যহত করতে পারে, এমন কি অনিরাপদ করে দিতে পারে। জলোচ্ছাসের সময় সতর্ক-সঙ্কেত উপেক্ষা করে কোন সমুদ্রগামী জাহাজ চলতে থাকলে জাজাজডুবি হয়ে যাত্রীদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে, তখন আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে উদ্ধার করার কেউ থাকে না। সমুদ্র উপকূলের কতগুলো বিপদ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১) উপকূলে আছড়ে পড়া ঢেউ (Shorebreaks)ঃ এটা এমন একটি মহাসাগরীয় অবস্থা যখন ঢেউগুলি সরাসরি উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে। উপকূলেআছড়ে পড়া ঢেউগুলো পানিতে নামা মানুষের শরীরের প্রান্তীয় অংশগুলিতে এবং গ্রীবাদেশীয় মেরুদন্ডে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। পানিতে নামার আগে ঢেউয়ের অবস্থা সম্বন্ধে কর্তব্যরত জীবনরক্ষীকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নেয়া উচিত নতুবা ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

২) উপকূল হতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত শক্তিশালী দ্রুতগামী নালা স্রোত (Rip currents) ঃ এগুলো উপকূল হতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত পানির শক্তিশালী নালাস্রোত যেগুলো সন্তরণকারীদেরকে দ্রুত সমুদ্রের ভিতর নিয়ে যায়। ফলে তাদের সলিলসমাধি হতে পারে। সমুদ্র উপকূলে সাঁতার কাটার সময় সর্বদা জীবনরক্ষীর সঙ্গে সাঁতারানো উচিত, কারণ সে আপনাকে এসকল স্রোতের বিপদ থেকে সাহায্য করতে পারে। যেহেতু নালাস্রোত অল্প পরিসরের নালারূপে উপকূল হতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় সেজন্য এ হতে বাঁচতে হলে স্রোতের প্রতিকূলে না সাঁতরিয়ে উপকূলের সমান্তরালে কিছুক্ষণ সাঁতরালে ঐ স্রোতের কবল থেকে বেরিয়ে স্রোতহীন এলাকায় চলে আসা যায়। তখন সেখান থেকে সাঁতরিয়ে কিনারে উঠে আসা যায়। জীবনরক্ষীরা প্রতি বছর আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রে হাজার হাজার লোককে নালাস্রোতের কবল হতে উদ্ধার করে থাকে, তারপরও সেখানে প্রতিবছর প্রায় ১০০ লোক নালা স্রোতের দ্বারা নিহত হয়। সুতরাং এ স্রোতের বিপদের সময় একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

৩) বিদ্যুৎচমক (Lightning)ঃ মহাসমুদ্রের বুকে বিদ্যুৎচমক নৌকা বা জাহাজের জন্য আধুনিক কালে যদিও কোন ভয়াবহ ঘটনা নহে তবু একসময় এটা সমুদ্রযাত্রীদের অনেক ক্ষতি করত। প্রাচীন কালের কোন ঘটনা যদিও খুব একটা জানা নেই, তবু অনুমান করা যায় যে বিদ্যুৎচমকের কারণে মহাসাগরের বুকে তখন কাঠের তৈরী নৌকা বা জাহাজ চলাচল খুব একটা নিরাপদ ছিল না, কারণ উচ্চতম মাস্তল হতে পানিতে বিদ্যুৎচমকের বিদ্যুৎ স্থানান্তরের পরিবাহী ব্যবস্থা না থাকলে হয়ত জাহাজই ধ্বংস হয়ে যেত। মধ্য যুগে মহাসমুদ্রে কাঠের তৈরী জাহাজ বিদ্যুৎচমকের দ্বারা আক্রান্ত হত। প্রধান মাস্তল ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হওয়া ছিল বড় বিপদ। বড় বড় কাঠের খোলাকুঁচি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। কোন কোন সময় নাবিক আহত হত কিংবা সে পোত-তল (Deck) হতে ধাক্কা খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ত । পাল এবং দড়িদড়াতে আগুন লেগে যেত, ফলে অফিসারদের ও নাবিকদের বৃষ্টির পানি অথবা বাতাসে আগুন নিভাতে হত। নাবিকরা মিলে জাহাজ মেরামত করত এবং জাহাজ চালনা অব্যাহত রাখত। রক্ষাকারী বিদ্যুৎচমক দন্ড - যাকে কোন কোন সময় বজ্রদন্ডও বলা হত সেটা প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহার করে জাহাজকে বিদ্যুৎচমক থেকে রক্ষা করা হত। পরবর্তী সময় জাহাজে মাস্তল হতে মহাসমুদ্রের পানির সাথে সংযোগকারী শিকল ব্যবহার করা হত এবং তা না থাকলে জাহাজে বিদ্যুৎচমকের দ্বারা ভয়াবহ বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ ঘটে যেত।

চিত্র নং ৪। বিদ্যুৎচমক (Lightning)|

আরও পরে জাহাজের মাস্তলের সাথে সরাসরি তাম্র যুক্ত করে সেটাকে জাহাজের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে পানিতে নামিয়ে দিত। আধুনিক জাহাজের চারিদিকে তড়িৎ পরিবাহী পরিবেষ্টক লাগিয়ে মহাসমুদ্রের পানির মাধ্যমে মাটির সাথে যুক্ত করে বিদ্যুৎচমক থেকে রক্ষা করা হয়।

তীরে প্রমোদ ভ্রমণের সময় অথবা তীরবর্তী পানিতে সন্তরণ কাটার সময় বিদ্যুৎচমকের দ্বারা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আহত বা নিহত হতে পারে। তাই মেঘাচ্ছন্ন

ঝড়ো দিনে সাগর পাড়ে না যাওয়াই ভাল, গেলেও সে সময় নিকটবর্তী কোন আশ্রয় স্থলে আশ্রয় নেয়া ভাল।

৪) উত্তাপ ও রৌদ্রদহন (Heat and sunburn) ঃ সমুদ্র পাড়ে রৌদ্রস্নান করার সময় রৌদ্রদহন হতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বন্যা, বিদ্যুৎচমক, টর্ণেডু, হারিকেন ইত্যাদিতে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক মারা যায় একমাত্র রৌদ্রদহনের মত আবহাওয়া সম্পৃক্ত কারণে। ঐসব দেশে মানুষ বিশেষ করে মহিলারা বিশ্বাস করে যে, রৌদ্রস্নান করলে ত্বক অধিকতর মসৃন ও আকর্ষণীয় হয় এবং ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। সেজন্য তারা অধিক সময় ধরে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রৌদ্রস্নান করে। তাদের বিশ্বাসটা পুরোপুরি সত্য নয় । কারণ ফর্শা মেয়েদের ত্বকে রৌদ্রের ক্ষতিকর কিরণ ইউ ভি (uv or ultraviolet rays) প্রতিরোধী মেলানীন [Melanin (কালো রংএর রসায়নিক পদার্থ)] উৎপাদন কম হয়। যার ফলে এসব ক্ষতিকর কিরণরশ্মি তাদের ত্বকে কেন্সার রোগের সৃষ্টি করে এবং এতে বহুলোক মারা যায়। তাছাড়া সাগরপাড়ের বালুরাশি এবং পানির প্রতিফলনের ফলে সূর্যকিরণ আরও তীব্রতর হয়। রৌদ্রস্নানের সময় রোদাবরণ (Sunscreen)) এবং রোদের ক্ষতিকর ইউ ভি (uv) রশ্মি হতে ত্বক রক্ষাকারী পোশাক পরিধান করা উচিত। দুপুর হতে ২টা পর্যন্ত সূর্যকিরণ যখন চরম উত্তপ্ত হয় তখন এটাই বিবেচনাসম্মত যে, কোন ছাতার নিচে অথবা কোন ছায়াময় বৃক্ষের নিচে বসা এবং মাঝে মাঝে বিরতির জন্য কোন ঘরের মধ্যে অথবা কোন আবরণের নিচে আশ্রয় নেয়া। নতুবা ত্বক কেন্সার একবার হয়ে গেলে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

৫) পানির গুণাগুণ (Water quality)ঃ পানির গুণাগুণ বলতে পানির রাসায়নিক, ভৌতিক, জৈবিক ও বিকিরণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহকে বুঝায়। পানির গুণাগুণ নিরূপণের জন্য সাধারণভাবে যেসকল মাণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোতে ইকোসিস্টেমের [Ecosystem{এটা এমন একটা পদ্ধতি (System) যাতে কোন এলাকার সকল জৈব ও অজৈব উপাদান একত্রে মিলে একটি একক(Unit)) হিসাবে কাজ করে থাকে ; যথা - পুকুর, হ্রদ এদের প্রতিটি এক একটি ইকোসিস্টেমের উদাহরণ}] সুস্থতা, মানুষের সংস্পর্শনের নিরাপত্তা এবং খাবার পানির বর্ণনা দেয়া হয়।

যেহেতু পানি স্থলভাগ হতে নদী -নালা ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্রের উপকূলীয় পানিতে গিয়ে মিশে, ফলে স্থলভাগের বিভিন্ন দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ সাগরে গিয়ে পতিত হয়। এসব দূষিত পদার্থের মধ্যে নর্দমার পঁচা পানি, কিটনাশক, সার, শিল্পাঞ্চলের দূষিত বর্জ পদার্থ ইত্যাদি অন্যতম। উপকূলীয় পানিতে উচ্চমাত্রার বেকটেরিয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ সন্তরণকারীদের কলেরাসহ অন্যান্য পেটের পীড়া সৃষ্টি করে মহামারি ঘটাতে পারে। মহামারির সময় সবাই আল্লাহ ভরসা করে কিন্তু রোগ নিরাময়ের পর আবার আল্লাহকে ভুলে যায়।

৬) সামুদ্রিক ভগ্নাবশেষ (Marine debris) ঃ প্রচুর পরিমাণে বিনষ্ট প্লাস্টিক, ধাতবদ্রব্যাদি, রাবার, কাগজ, বোনা দ্রব্যাদি, পরিত্যক্ত মাছ ধরার জাল, নৌকা, জাহাজ এবং অন্যান্য হৃত ও পরিত্যাক্ত দ্রব্যাদি সমুদ্র উপকূলে জমে জীবজন্তুর বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটায় এবং বন্যজন্তুর ক্ষতিসাধন করে ও উপকূলরেখায় ভ্রমণকারীদের ও সমুদ্রের পানিতে সন্তরণকারীদের অনিরাপদ করে তুলে।

৭) ক্ষতিকর শৈবালের চরম উৎকর্ষতা (Harmful algal blooms)ঃ একে সাধারণতঃ রেড টাইড (Red tides) নামে অভিহিত করা হয়। এটা হল উপকূলীয় পানিতে নিবিড়ভাবে উৎপন্ন শৈবালকানন বা চরম উৎকর্ষিত শৈবালরাশি। এর একটি ক্ষুদ্র শতকরা অংশ সামুদ্রিক প্রাণী এবং মানুষের জন্য বিষাক্ত হয়। কোন কারণে এ বিষ যথেষ্ট পরিমাণে পেটে ঢুকলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এটাও এক বড় বিপদ যা ঘটলে মানুষ আল্লাহকে ডাকতে থাকে।

৮) জেলিফিশ (Jellyfish)ঃ জেলিফিশ অথবা জেলিস হল একপ্রকার কোমলদেহী, স্বাধীনভাবে সন্তরণকারী জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণী যাদের দেহ শিরিসময় (gelatinous) ছত্রাকৃতির ঘন্টার (Bell) মত যাতে লতানো শূঁয়া (Tentacles)) থাকে। ঘন্টাটি স্পন্দিত হয়ে জেলিফিশ পরিচালন ও গতিশক্তি লাভ করতে পারে।

জেলিফিশের ২০০০ প্রজাতির মধ্যে মাত্র ৭০টি প্রজাতি মানুষের ক্ষতি করতে পারে অথবা মাঝে মাঝে মানুষকে মেরেও ফেলতে পারে। সমুদ্র কিনারে সাঁতার কাটার সময় অথবা সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেলে এসব বিষাক্ত জেলিফিশ আক্রমণ করতে পারে এবং মেরেও ফেলতে পারে। কিনারে সাঁতার কাটার সময় আক্রান্ত হলে জীবনরক্ষীরা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে পারে অথবা এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। গভীর সমুদ্রে আক্রান্ত মানুষ বাঁচার জন্য এক মাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা করতে পারে।

৯) অগ্নি প্রবাল (Fire coral) ঃ এর বৈজ্ঞানিক নাম মিলেপরা (*Millepora* sp.) । এসকল ছোট ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণী তাদের অদৃশ্য শূঁয়ার (Tentacles) সাহায্যে শক্তিশালী হুল ফুটাতে পারে। এর ফলে সামান্য জ্বালা হতে প্রচন্ড বেদনা পর্যন্ত হতে পারে এবং কোন কোন সময় অরুচি ও বমির উদ্রেক করতে পারে।

১০) নীল অঙ্গুরীয় অক্টোপাস (Blueringed Octopus) ঃ এর বৈজ্ঞানিক নাম *Hapalochlaena* ; এটা আরেকটি ছোট প্রাণী যা প্রচন্ড আঘাত করে ছিদ্র করে ফেলে । দৈর্ঘ্যে ৮ ইঞ্চির চাইতে দীর্ঘ নয়, এসকল অক্টোপাসে প্রচুর বিষ থাকে যার সাহায্যে একটি মানুষকে সহজে বধ করে ফেলতে পারে। এদের এত বিষ যে, এরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ৩০ জন মানুষ মেরে ফেলতে পারে। এর বিষ সিয়ানাইডের বিষের চাইতে ১০,০০০ গুণ বেশী শক্তিশালী।৯

১১) শিকারী ও বিষাক্ত মাছ -

ক) হাঙ্গর (Sharks)ঃ হাঙ্গররা এমন কি উপকূলের নিকটবর্তী পানিতেও আক্রমণ করতে পারে। নিজের ঝুঁকি এড়াতে উপকূল হতে বেশ দূরে সাঁতার কাটতে যাওয়া উচিত নয়, দলে দলে সাঁতার কাটা উচিত, অন্ধকার অথবা গোধূলির সময় সাগরে নামা পরিহার করতে হবে এবং ক্ষত স্থান হতে রক্ত ঝরার সময়ও পানিতে নামা উচিত নয়। উজ্জ্বল অলঙ্কারাদি ঘরে রেখে যাওয়া উচিত এবং উজ্জ্বল রঙ্গের সাঁতার কাটার পোশাকও পরিহার করা উচিত।

খ) স্টিং রে (Sting ray): এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dasyatis brevicaudata* ; এটা এক প্রকার হুল ফুটানো রে মাছ যার লেজে বা পাখনায় এক ধরনের কাঁটা থাকে। এ কাঁটার সাহায্যে সে মানুষকে বা অন্য কোন প্রাণীকে আহত করতে পারে। ইহা সাধারণতঃ চড়াও হয়ে আক্রমণ করে না বা সক্রিয়ভাবে আত্মরক্ষা করে না। ভয় দেখালে প্রথমে সাঁতরিয়ে পালিয়ে যায়। তবে কোন আক্রমণকারী আক্রমণ করলে বা পদদলিত করলে লেজের হুলটি বেরিয়ে এসে দেহপ্রাচীরে ঢুকে যায় এবং গুরুতরভাবে আহত করে।

গ) বৈদ্যুতিক রে (Electric ray) : এটা টরপেডু, টরপেডু মাছ, অবশমাছ বা দমন মাছ নামেও পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Narcine bresiliensis* ; পৃথিবীব্যাপী একে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অগভীর পানিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোন কোন বৈদ্যুতিক রে (যেমন- *Benthobatis*) প্রায় ১০০০ মিটার (৩৩০০ ফিট) গভীরে পাওয়া যায়; এগুলো অধিকতর শ্লথগতিসম্পন্ন তলদেশে বসবাসকারী এবং মৎসভোজী ও অমেরুদন্ডীপ্রাণিভোজী রে মাছ। স্পর্শ বা পদদলিত না করলে এরা সাধারণতঃ কোন ক্ষতি করে না। প্রতিটি বৈদ্যুতিক অঙ্গ রূপান্তরিত পেশীকোষে গঠিত এবং এক একটি করে মাথার দুপাশে দুটি অবস্থিত থাকে। এসকল বৈদ্যুতিক অঙ্গের আঘাত (Shock) আত্মরক্ষা, অবস্থানের অনুভূতি এবং শিকার ধরায় ব্যবহৃত হয়। উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শকের পরিমাণ ২২০ ভোল্ট পর্যন্ত পৌছে, যা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে ফেলে দিবার জন্য যথেষ্ট।

এগুলো ছাড়াও অনেক মাছ রয়েছে যেগুলো মানুষের জন্য সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে। এরূপ আরও কতগুলো বিপদসঙ্কুল মাছ সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা দেয়া হল -

ক) ডোরাকাটা সার্জন মাছ (Stripped surgeonfish): এটি একটি ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আকর্ষনীয় প্রবালপ্রাচীর

এলাকার মাছ। বৈজ্ঞানিক নাম *Acanthurus*। এর লেজের কাঁটা বিষাক্ত ; এ বিষ মারাত্মক।

খ) বেরাকুডা (Barracuda) : বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর আকৃতির এ মাছটি এর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Sphyraena* । একবার ফ্লোরিডা উপকূলে একটি বেরাকুডা পানি হতে প্রচন্ডভাবে লাফ দিয়ে এক মহিলার পাজরে এমনভাবে আঘাত করে যে মহিলাটির পাজর ভেঙ্গে যায় ও ফুস্‌ফুস্‌ ছিদ্র হয়ে যায়। তবে মহিলাটি তার পুরুষ বন্ধুর সহায়তায় কোন রকমে বেঁচে যায়।

গ) মরে বাইন মাছ (Moray eel) : একে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বৃহত্তম আকৃতির প্রজাতিটি (*Gymnothorax javanicus*) পাওয়া যায় উষ্ণমন্ডলীয় মহাসমুদ্রের প্রবাল প্রাচীর অঞ্চলে। এটা ডুবুরী মানুষকে আক্রমণ করে। কোন কোন মরে বাইন মাছের শ্লৈষ্মিক পদার্থে (Mucous) বিষ (Ciguatera toxin) থাকে। বিরক্ত করলে ইহা মানুষকে আক্রমণ করে। সিগুয়াটেরা বিষ বমন, ব্যথা, কার্ডিয়াক ও স্নায়ুবিক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ) বিষাক্ত টোডমাছ (VenomousToadfish): এর বৈজ্ঞানিক নাম (*Thalassophryne* sp.)। এটা আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়। এর পৃষ্ঠীয় ডানা (Dorsal fin) ও ফুলকার ঢাকনায় (Gill cover) ফাঁপা কাঁটা থাকে যার মাধ্যমে এটা মানুষের গায়ে বিষ ঢুকিয়ে ভয়ানকভাবে আহত করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে আহত ব্যাক্তি মরেও যেতে পারে যদিও এটা বিরল ঘটনা।

ঙ) নিড্‌ল মাছ (Needle fish) : এর বৈজ্ঞানিক নাম *Belone belone*; একে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পানিতে পাওয়া যায়। এরা পানির উপরিতলে ভেসে বেড়ায় এবং রাত্রিকালে কৃত্তিম আলো এদেরকে উত্তেজিত করে। ভীত হলে কিংবা রাতের বেলায় আলো দেখলে এরা পানির উপর লাফিয়ে উঠে। যদিও এটি ছোট মাছ, তবু এটি মানুষকে ভীতসন্ত্রস্থ করে তুলতে পারে। পানির উপরে এদের লাফিয়ে উঠার ক্ষমতা মাছ শিকারীকে আহত করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। এরা ঘন্টায় ৩৮ মাইল গতিতে পানির বাইরে লাফিয়ে উঠতে পারে ; এদের ধারালো ঠোঁট মানুষের দেহে জোরে চাপ দেয়, ফলে ঠোঁটটি ভেঙ্গে মানবদেহের অভ্যন্তরে থেকে যেতে পারে। হাওয়াই দ্বীপে এ মাছের আঘাতে দুজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

চ) সিংহমাছ বা লায়ন মাছ (Lion fish) : এদের বৈজ্ঞানিক নাম *Pterois volitans*, *Pterois miles* ইত্যাদি। এদেরকে কেরিবিয়ান সমুদ্র ও আটলান্টিক মহাসাগরে পাওয়া যায়। সম্ভবত: এটা সব চাইতে সুন্দর সামুদ্রিক প্রাণী। এর হুল ফুটানো তত মারাত্মক না হলেও ভয়ানক বিষাক্ত ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাহামার ফোর্ড কে এর নিকট এটা ১০০০ ফিট (৩০৫ মি) গভীরতায় পরিদৃষ্ট হয়।

ছ) পাথর মাছ (Stonefish): এর বৈজ্ঞানিক নাম *Synanceia* sp. ; এর দৈর্ঘ মাত্র ১৪-২০ ইঞ্চির মত কিন্তু মাছের মধ্যে এটাই সর্বাধিক বিষাক্ত। এটা পানির নীচে পাথরের মধ্যে যখন নিজেকে পুরাপুরি লুকিয়ে রাখে তখন একে দেখতে পাথরের মতই লাগে। একে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এর ওজন ৫ পাউন্ডের মত হয়। এরা প্রবাল প্রাচীরের নিকট পানির নীচের প্রস্তরাদির মধ্যে বসবাস করে ।

১২) বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ (Poisonous sea snakes)ঃ *Pelamis platura*, *Notechis scutatus* ইত্যাদি বেশ কিছু বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ রয়েছে। এদের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৪-১০ ফিট হয় । বিষাক্ত সাপগুলোকে সাধারণতঃ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক সাপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল যে, এদের লেজ সাধারণতঃ চেপ্টা থাকে কারণ এরা সাধারণতঃ পানিতেই সাঁতার কেটে চলাফিরা করে, স্থলভাগে আসে না। সামুদ্রিক সাপগুলো সাধারণতঃ ভয়ানক বিষাক্ত হয় এবং এরা কামরালে মানুষ বাঁচে না। কোন কোন সামুদ্রিক সাপ কামরালে স্নায়ুতন্ত্র বিষাক্ত হয়ে যায় এবং রক্ত জমাট বেধে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

১৩) কুমীর (Crocodiles) ঃ এরা বেশ বড় সরিসৃপ এবং আস্ত একটা মানুষ পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে। এরা ইন্ডোপেসিফিক (Indopacific)

অঞ্চলে বসবাস করে এবং জীবন্ত সরিসৃপদের মধ্যে সবচাইতে বড় প্রাণী। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ কুমীরের দৈর্ঘ ৪.৩ - ৫.২ মিটার হয় এবং ওজনে এরা ৪০০ - ১০০০ কেজি পর্যন্ত হয় । প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী কুমীরের দৈর্ঘ ২.৩ - ৩.৫ মিটার হয় এবং ওজনে এরা ৪০-১০০ কেজি পর্যন্ত হয়। এরা সামুদ্রিক পরিবেশে বসবাস করতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ লবণাক্ত ও হালকা লোণা ম্যাংগ্রোভ (Mangrove) জলাভূমিতে, নদীর মোহনায়, নদী -মুখস্থ ব-দ্বীপ অঞ্চলে, লোণা পানি প্রবেশ করে এমন অগভীর হ্রদে এবং নদ-নদীর নিম্নাঞ্চলে বসবাস করে। সচরাচর পাওয়া যায় এমন একটা সামুদ্রিক কুমীরের বৈজ্ঞনিক নাম *Crocodylus porosus*। সমুদ্রের উপকূল ও অভ্যন্তরে উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভয়ঙ্কর উদ্ভিদ ও প্রাণীর কবল হতে বাঁচতে হলে সমুদ্রগামী মানুষকে যেমন চেষ্টা-তদবির করতে হবে তেমনি পরম করুণাময়ের উপর নির্ভর করতে হবে। করুণাময় আল্লাহর দয়া ছাড়া চেষ্টা-তদবির করারও সুযোগ থাকে না। এরকম গুরুতর বিপদ-আপদ থেকে যখন আল্লাহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তখন বেঈমান মানুষ বলতে থাকে যে, সে অমুক অমুক ওসিলায় বেঁচে গেছে। এটাই মনুষ্য জাতির স্বভাব । সেজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অকৃতজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(١٦) ﴿ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴾

অর্থ - অথবা তোমরা কি একথা হতে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে, আল্লাহ তা'লা তোমাদিগকে পুনরায় তাতেই (সমুদ্রের দিকেই) নিয়ে যেতে পারেন না, পুনরায় তোমাদের প্রতি ভীষণ ঝড় প্রেরণ করতে পারেন না, অবশেষে তোমাদের কুফরীর কারণে তোমাদিগকে ডুবিয়ে দিতে পারেন না ? তখন তোমরা এ ব্যাপারে আমার পশ্চাদ্ধাবনকারী কাউকে পাবে না।

(১৫ নং পারা ঃ সুরা নং ১৭ বণি ইসরাইল ঃ রুকু নং ৭ ঃ আয়াত নং ৬৯)।

সাধারণতঃ সমুদ্রে তিন রকমের ঝড় হয় ঃ ১) হারিকেন, ২) টাইফুন ও ৩) সাইক্লোন ।

সামুদ্রিক ঝড় যখন আটলান্টিক অথবা পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে হয় তখন সেটা হারিকেন নামে পরিচিত হয় ; যখন পশ্চিম উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে উৎপন্ন হয় তখন সেটা টাইফুন নামে পরিচিত হয় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরে হলে একে সাইক্লোন বলা হয়। হারিকেন ও টাইফুন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। নিম্নলিখিত কারণে সামুদ্রিক ঝড় সংঘটিত হয় –

১) পানির তাপমাত্রা কম পক্ষে ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) হলে,

২) আর্দ্র বায়ু সাপেক্ষে,

৩) সমুদ্রের উপরিতলের তাপমাত্রা অতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে,

৪) ক্রমাগতভাবে বাষ্পীয়ভবণ ও ঘনীভবন চক্র চলতে থাকলে,

৫) বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন গতির (একস্থানাভিমুখী) বায়ুর পারস্পরিক সংঘর্ষণ হলে,

৬) সমুদ্রের উপরিতলের বায়ুচাপ ও অনেক উপরের বায়ুচাপের মধ্যে পার্থক্য হলে।

সাধারণতঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের কোন স্থানের বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে গেলে সে স্থানে নিম্ন চাপের (বায়ুশূণ্যতার) সৃষ্টি হয় এবং তখন সে স্থানে চতুর্দিক হতে উচ্চচাপের ঠান্ডা ভারি বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে শূণ্যতা পূরণ করে। যদি এ ভারি বায়ু প্রবাহের গতি ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার

অথবা তার উর্দ্ধে হয় তখন একে সাইক্লোন বলে। এ গতি ঘন্টায় ২৯০ কিলোমিটার (১৮০ মাইল) পর্যন্ত উঠতে পারে।১০ প্রবল বায়ু প্রবাহের কারণে সমুদ্রে চলমান বড় বড় পোক্ত জাহাজ পর্যন্ত ডুবে যেতে পারে, ফলে জানমালের সলিল সমাধি হতে পারে। সমুদ্রে যখন মানুষ এরূপ বিপদগ্রস্থ হয় তখন তারা খাঁটি অন্তরে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ কেবল দয়ার্দ্র হলেই তারা উদ্ধার পেয়ে বেঁচে যেতে পারে। যখন তারা উদ্ধার পায় তখন অনেকেই আল্লাহর দয়ার কথা ভুলে গিয়ে আবার কুফুরিতে লিপ্ত হয়। সেজন্যই উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'লা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, মানুষ নিজ প্রয়োজনেই আবার সমুদ্রে যেতে পারে অর্থাৎ তিনি তাদিগকে আবার সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারেন, ভীষণ ঝড় প্রেরণ করে তাদিগকে ডুবিয়ে মারতে পারেন ; তখন একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত তাদের আর কোন উদ্ধারকারী থাকবে না।

﴿ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیْلًا ﴾ (١٧)

অর্থ – নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদেরকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদিগকে জলে ও স্থলে বাহন দান করেছি, তাদিগকে উত্তম রিযিক দিয়েছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

(১৫ নং পারা ঃ সুরা নং ১৭ বণি ইসরাইল ঃ রুকু নং ৭ ঃ আয়াত নং ৭০)।

কিরূপে আল্লাহ তা'লা আদমসন্তানকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে কিরূপ উত্তম ও নিখুঁত গঠনে সৃষ্টি করেছেন তা তিনি নিম্ন আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরেকে বলে দিচ্ছেনঃ

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسٰنَ فِیْۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ﴾ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি (৯৫:৪)।

সে তার দুপায়ে খাড়া হয়ে চলে এবং হাত দিয়ে তুলে আহার করে অথচ অন্যান্য প্রাণী দু পায়ে অথবা চার পায়ে অথবা যাদের পা নেই তারা বুকের উপর ভভর দিয়ে ভূমির সমান্তরাল হয়ে চলে এবং সাধারণতঃ তারা সরাসরি তাদের মুখ দিয়ে আহার করে। তবে মানুষের মত অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বর্গভূক্ত স্তন্যপায়ী (Mammalian) প্রাইমেট (Primates) প্রাণীগুলোও তাদের সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা খাবার তুলে আহার করতে পারে। একমাত্র মানুষকেই আল্লাহ তা'লা বিবেকবান করে সৃষ্টি করেছেন, কারণ সে দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ তার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আল্লাহ তা'লা মানুষকে স্থলে ভারবাহী পশু - গরু, ঘোড়া. গাধা, খচ্চর, উট, হাতী ইত্যাদি বাহন দান করেছেন। এরা ছিল বন্য পশু, তিনি এদেরকে মানুষের পোষ মানিয়ে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। বাহন হিসাবে মানুষ নৌকা, জাহাজ, স্টিমার ইত্যাদি তৈরী করে জলে (সাগর, নদ-নদী ইত্যাদিতে) চলাচল করতে পারে। আল্লাহই এসকল ভারবাহী পশু, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিকে মানূষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। আগেই বলেছি যে, নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে এসকল বাহন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় এবং জলযানসমূহ আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে জলে ভেসে থাকে। প্রকৃতিতে আবহমান কাল ধরে সক্রিয় এসকল সূত্র আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তারই হুকুমের নিয়ন্ত্রণাধীন।

মানুষকে তিনি সকল প্রকার সুস্বাদু, পছন্দসই গন্ধ, রং ও সুন্দর আকৃতি-প্রকৃতির কৃষিজাত শস্য, ফল-ফলাদি, মাংস, দুধ ইত্যাদি হালাল খাদ্যদ্রব্য এবং তার নিজের জন্য তৈরী করা অথবা অন্যান্য অঞ্চল ও দেশ হতে আমদানীকৃত সকল রংএর ও আকারের সুন্দর সুন্দর পোশাক দান করেছেন।

আল্লাহ তা'লা আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার পরই ফেরেস্তা সর্দার ইবলিশকে আদেশ করেছিলেন তাকে সেজদা করার জন্য এবং সে আদেশ অমান্য করার কারণে তাকে চির অভিশপ্ত করে বেহেস্ত থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ইবলিশ জ্জীন জাতির অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমলের কারণে সে ফেরেস্তাগণের সর্দার হতে পেরেছিল। আদম (আঃ) নবী ছিলেন, সুতরাং নবী -রসুলগণ জ্জীন জাতি ও ফেরেস্তাগণের চাইতে মর্যাদাবান, তা না হলে আল্লাহ ফেরেস্তা-সর্দার ইবলিশ জ্জীনকে আদম (আঃ)কে সেজদা করার কথা আদেশ করতেন না। তফসীরকারগণের সাধারণ অভিমত এই যে,

আওলিয়া-দরবেশগণ সাধারণ ফেরেস্তাদের চাইতে অধিক মর্যাদাশীল তবে বিশেষ ফেরেস্তা - যেমন জিব্রাঈল, মীকাঈল প্রমুখ, তারা আওলিয়া- দরবেশগণ হতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষ জন্তু জানোয়ারের চাইতে অধম। কারণ কোরআনে বলা হয়েছে যে,

﴿ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ﴾

অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়, বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত (৭:১৭৯)–(মাযহারী)।

(১৮) ﴿ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ﴾

অর্থ - যখন মুসা তার সহচর যুবকটিকে বললেন, "আমি ক্ষান্ত হব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব যে পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হব।"

(১৫ নং পারা ঃ সুরা নং ১৮ ঃ সুরা কাহ্‌ফ ঃ রুকু নং ৯ ঃ আয়াত নং ৬০)।

মুসা (আঃ) একদিন এমন এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন যে, যারা সেটা শুনল তারা সকলেই গভীরভাবে উদ্দীপিত হল। মজলিসের একজন জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর নবী , পৃথিবীতে কি আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী অন্য কেহ আছে ?" আল্লাহ মুসা (আঃ)কে অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন ও তৌরাত কিতাব দিয়ে তাকে সম্মানীত করেছিলেন বলে তার এমন বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তাই জবাবে বললেন, "না !" আল্লাহর কাছে মুসা (আঃ)এর একথাটা পছন্দ হয়নি। নবী হিসেবে তার বলা উচিত ছিল 'আল্লাহই ভাল জানেন।' এ জওয়াবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আঃ)এর প্রতি তিরস্কারের সুরে ওহি নাযিল হল, "দু সমুদ্রের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী।" একথা শুনে মুসা (আঃ) ঐ ব্যক্তির নিকট হতে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে তার ঠিকানা বলে দিন।' আল্লাহ বললেন, "থলের ভেতর একটি মাছ নিন এবং দু সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এ বান্দার সাক্ষাত পাবেন।" মুসা (আঃ) নির্দেশমত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার সাথে তার যুবক খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখন্ডের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে মাছটি হঠাৎ নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্ট একটি সুরঙ্গ পথে সমুদ্রে নেমে গেল। মুসা (আঃ) যখন জাগ্রত হলেন, তখন শয়তানের প্ররোচনায় ইউশা ইবনে নূন মাছের এ আশ্চর্য ঘটনা তাকে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আঃ) খাদেমকে বললেন, "আমার নাশ্‌তা আন। এ সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" নাশ্‌তা আনার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওজর পেশ করে বলল, 'শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।' অতঃপর সে বলল, 'মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে।' তিনি বললেন, 'সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল।'

সেমতে তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখন্ডের নিকট পৌছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মুসা (আঃ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আঃ) বললেন, "এ (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল ?" মুসা (আঃ) বললেন "আমি মুসা।" হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন, "বনি ইসরাঈলের মুসা ?" তিনি জওয়াব দিলেন, "হাঁ, আমিই বনি ইসরাঈলের মুসা। আমি

আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।" হযরত খিযির বললেন, " আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না হে মুসা, আমাকে আল্লাহ তা'লা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার কাছে নেই ; পক্ষান্তরে, আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আমি জানি না।" মুসা (আঃ) বললেন, "ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।" অতঃপর মুসা (আঃ)কে সে বিশেষ জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে তারা একসাথে সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে তাদেরকে বিনা ভাড়ায় বহনকারী নৌকার তক্তা তুলে ফেলে, একটি নিরাপরাধ বালককে হত্যা করে এবং তাদেরকে খাদ্য দানে অস্বীকার করা গ্রামবাসীর পতনোন্মুখ একটি প্রাচীরকে সোজা করে দিয়ে খিযির (আঃ) ঐসকল কাজের রহস্য মুসা (আঃ)কে শিখিয়ে দিলেন।

দু সাগরের সঙ্গমস্থল দ্বারা আল্লাহ তা'লা কোন দু সাগরকে বুঝিয়েছেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। হয়ত বা সে দুটি সাগর ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর হতে পারে (চিত্র ৫) এবং এদের মিলনস্থল হল সে স্থানটি যেখানে সুয়েজ খালের পার্শ্বে বিটার হ্রদ ও তিমাহ হ্রদ দৃষ্ট হয়। লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সূয়েজ উপসাগর ও আকাবা উপসাগরের মিলনস্থলেও হতে পারে (চিত্র ৬)। কারণ মিশর ছেড়ে আসার পর এ পূরা এলাকাটা বনি ইসরাঈলদের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। ১১

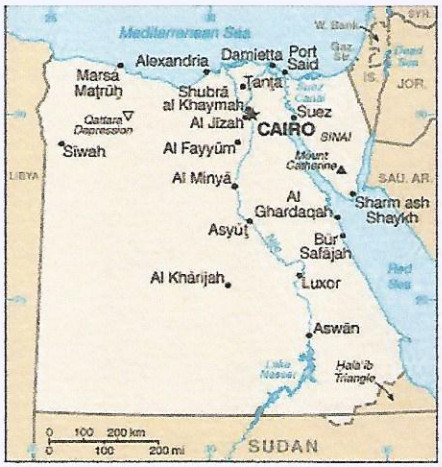

চিত্র নং ৫। লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর।

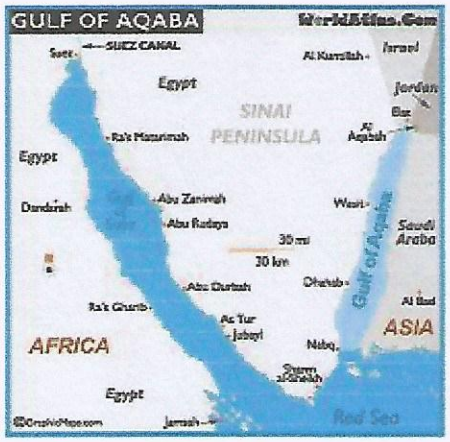

চিত্র নং ৬। সূয়েজ উপসাগর ও আকাবা উপসাগরের মিলনস্থল

(১৯) ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾

অর্থ - অতঃপর যখন তারা দু সাগরের মিলনস্থলে পৌছালেন, তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সাগরে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল।

(১৫ নং পারা ঃ সুরা নং ১৮ ঃ সুরা কাহ্‌ফ ঃ রুকু নং ৯ ঃ আয়াত নং ৬১)।

উপরের আয়াতটি হতে জানা যায় যে শুধূ মুসা (আঃ)এর খাদেম একা নয় বরং তারা দুজনেই মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

বোখারীর হাদীস থেকে মাছটি সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকেই থলেতে মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এ ভাজা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে কিছু অংশ খেয়েও ছিলেন। মাছটির অবশিষ্ট অংশই জীবিত হয়ে সাগরে চলে যায়-(কুরতুবী)।

سَرَبَ অর্থ (বন্যজন্তুর) আস্তানা, আড্ডা, গর্ত, সুড়ঙ্গ ইত্যাদি। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সাগরে যেদিকে যেত সেদিকে সুরঙ্গের মত একটি পথ তৈরী হয়ে যেত। এত বড় একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখার পর খাদেম তা কেমন করে ভুলে গেল তার জওয়াব খাদেম নিজেই দিয়েছে। সে বলেছিল যে, শয়তান তাকে সেটা ভুলিয়ে দিয়েছিল। নবী রসুলগণকে শুধরাবার ও পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে এরূপ কষ্ট দিয়ে থাকেন। তারা আল্লাহর অতি প্রিয়জন হওয়ার কারণে তাদের সামান্য ভুল-ত্রুটিতেও তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং সাথে সাথে তা শুধরাবার ব্যবস্থা করে থাকেন। মৃত ভাজা মাছ কিরূপে জীবিত হয়ে সাগরে সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে সেপথে চলে যেতে পারে তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। সুড়ংপথ সৃষ্টি না করে সে মাছ তো এমনিতে অন্যান্য মাছের মত সাগরে চলাফেরা করতে পারত। সবই আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। সে মাছ সাগরে কোথায় গেল, কি খেত, কত দিন বেঁচে ছিল, তার কোন বংশধর বেঁচে আছে কিনা আমরা কিছুই জানি না এবং মানুষের পক্ষে তা জানা সম্ভবও নয়।

(٢٠) ﴿قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَ مَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج وَ اتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ق عَجَبًا﴾

অর্থ –সে বলল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখন্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি বিস্ময়করভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছিল !"

(১৫ নং পারা ঃ সুরা নং ১৮ ঃ সুরা কাহ্‌ফ ঃ রুকু নং ৯ ঃ আয়াত নং ৬৩)।

উপরের ৬১ নং আয়াতেও মাছের কথা ভুলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভুলে যাওয়ার জন্য খাদেম শয়তানকে দোষারূপ করেছে। মাছটি যে বিস্ময়করভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছিল সেটাও ৬১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন একটা আশ্চর্যজনক কথা খাদেম কেমন করে ভুলে গেল সেটাও কম আশ্চর্য্যজনক কথা নয় ! যেহেতু শয়তানই সে কথা তার প্রভুকে বলতে তাকে (খাদেমকে) ভুলিয়ে দিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে তখন অন্য ব্যাখ্যায় না যাওয়াই ভাল। যুক্তি হিসেবে খাদেমের নিশ্চেষ্টতা বা অবহেলার কথা এখানে বলা যাবে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে শয়তানও এ কাজ করতে পারত না। আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল তাঁর প্রিয় নবীকে আরও কষ্ট দিয়ে পবিত্রতর করে নেয়া।

(٢١) ﴿اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا﴾

অর্থ - নৌকাটির বিষয়ে – সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে (জীবিকার জন্য) শ্রমের কাজ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত।

(১৬ নং পারা ঃ সুরা নং ১৮ ঃ সুরা কাহ্‌ফ ঃ রুকু নং ১০ ঃ আয়াত নং ৭৯)।

কা'ব আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরী করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরী।

নৌকার মালিকদের এখানে মিসকীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নেছাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সেও মিসকীনের অন্তর্ভূক্ত। আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কম পক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নেছাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে –(মাযহারী)।

ইমাম বগভী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন যালেম বাদশাহ্ এ পথে চলাচলকারী সব নৌকা চিনিয়ে নিত। হযরত খিযির (আঃ) এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে যালেম বাদশাহ্‌র লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না, একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কারণ এ সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী। আল্লাহর ওহী ব্যতীত শরীয়তের নির্দেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া কেউ আল্লাহর ওহী পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশ্‌ফ ও এল্‌হামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হয় যে, খিযির (আঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন। তাকে ওহীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল।

তিনি যা কিছু করেছেন, তা এ ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণেই করেছেন। কোরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِیْ ؕ অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি, বরং আল্লাহর নির্দেশেই করেছি (১৮:৮২)।

মোট কথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিযির (আঃ)ও একজন নবী। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মুসা (আঃ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তফসীরে কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহিত, আবু হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন অজ্ঞাত বা গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অলৌকিকভাবে পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে এ ধরণের অস্বাভাবিক শরিয়ত বিরোধী কাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপকার করার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

(২২) ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا﴾

অর্থ – বলুন, "আমার পালনকর্তার কথা (লেখার জন্য) যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, (তবু) আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষিত হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।"

(১৬ নং পারা ঃ সুরা নং ১৮ ঃ সুরা কাহ্‌ফ ঃ রুকু নং ১২ ঃ আয়াত নং ১০৯)।

আল্লাহর কথা কলম-কালিতে লিখে কখনও শেষ করা যাবে না। সমস্ত সৃষ্ট জীবকে নিজ নিজ ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছেন আল্লাহ তা'লা, তাদের সকলের কথা তিনি বুঝেন, সকলের কথা তিনি শুনেন, ডাকে সাড়া দেন এবং সকলকেই দেখতে পান। যদিও আল্লাহর বাণীসমূহ ক্রমান্বয়ে লৌহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) থেকে নাযিল হয়েছে, তবুও শুধু এগুলোই আল্লাহর কথা নহে। যুগে যুগে নবী রসূলগণের প্রতি যেসকল ভাষায় আল্লাহর আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে কেবল সেগুলোই আল্লাহর ভাষা নহে যদিও ভাষা হিসেবে আরবীকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শুধু মাত্র একজন মানুষ জীবনে যত কথা বলে সেগুলোও তো লিখে শেষ করা কঠিন। তবে যিনি সকল কথার উৎস সেই আল্লাহর কথা কেমন করে লিখে শেষ করা যাবে ? উদাহরণ হিসেবে এখানে বলা হয়েছে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয় তবু আল্লাহর কথা লিখে শেষ করা যাবে না, এমন কি যদি আরেকটি সমুদ্রের পানি এনে এর সাথে যোগ করা হয়।

ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১% জায়গা পানি দ্বারা আবৃত এবং সমুদ্র-মহাসমুদ্রসমূহ পৃথিবীর সমস্ত পানির প্রায় ৯৬.৫% পরিমাণ ধারণ করে আছে। পানি জলীয়বাষ্পরূপে বায়ুমন্ডলে থাকে। তাছাড়া পানি নদ-নদী, হ্রদ, বরফস্তুপ(Icecaps), সুউচ্চ পর্বতগহ্বরস্থ তুষাররাশি(Glaciers)তে, আর্দ্রতারূপে মাটিতে, ভূনিম্নস্থ পানিবাহী শিলাস্তরে (Aquifers) এমনকি জীবদেহে বিদ্যমান থাকে। ১২

ভূপৃষ্ঠে পানির মোট আয়তন প্রায় ১.৩৮৬ বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার (৩৩৩ মিলিয়ন ঘন মাইল) ; এর ৯৬.৫% লোণা পানি ও ৩.৫% মিঠাপানি। কেবলমাত্র ০.৩% ভূপৃষ্টে তরল অবস্থায় আছে।১৩

পৃথিবীতে ৩২৬ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্যালন পানি রয়েছে। এ পানির ৩% এরও কম মিঠা পানি এবং এর ২/৩ ভাগ বরফস্থর ও পর্বতগহ্বরস্থ তুষাররূপে আবদ্ধ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত তরল পানি হতে অনেক বেশী মিঠা পানি ভূগর্ভে সঞ্চিত রয়েছে।

উপরে বর্ণিত পৃথিবীর এ বিশাল জলরাশি সাথে যদি আরও ঐ পরিমাণ জলরাশি যুক্ত করে কালি করা হয় তবু আল্লাহর কথা লিখে শেষ করা যাবে না কারণ তিনি যেমন অসীম অনন্ত তার কথাও তেমনি অসীম অফুরন্ত।

(٢٣) ﴿ اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَ عَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ﴾

অর্থ - যে, তুমি তাকে (মুসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় (সাগরে) ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দিবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। (১৬ নং পারা ঃ সুরা নং ২০ ঃ সুরা ত্বোয়া-হা ঃ রুকু নং ২ ঃ আয়াত নং ৩৯)।

এখানে ছেলে-শিশু নিধনকারী ফিরআউনের লস্করদের হাত থেকে শিশুটিকে রক্ষার জন্য কৌশল হিসেবে আল্লাহ তা'লা মুসার মাকে তার শিশুটিকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় (সাগরে) ভাসিয়ে দিতে আদেশ করছেন। দরিয়ার দ্বারা এখানে বাহ্যিকভাবে নীল নদকে বোঝানো হয়েছে, কারণ সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে যখন সেটা নীল নদের পাড়ে অবস্থিত ফিরআউনের প্রাসাদ-ঘাটে পৌছে তখন কৌতুহল বশতঃ সেখান থেকে সে সেটাকে তুলে আনে। আয়াতের ভাষা "দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দিবে" থেকে এটা স্পষ্ট যে সিন্দুকটির তীরে পৌছা আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে। কারণ দরিয়ার স্রোত, ঢেউ এবং এর উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এবং সাধারনতঃ এসকল বাহ্যিক শক্তির মাধ্যমে কোন বস্তু নদীর কিনারে এসে লাগে। আগেই বলা হয়েছে যে, কোন বস্তু পানিতে ভাসে আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে এবং এ সূত্র আবিস্কারের লক্ষ লক্ষ বছর পূর্ব হতেই পানিতে বস্তু ভাসত এবং এখনও ভাসে। সুতরাং পানিতে কোন বস্তু ভাসেও আল্লাহর হুকুমে। ভাসমানতার যে প্রাকৃতিক কারণ বা শক্তি, আর্কিমিডিস কেবল সেটাই আবিস্কার করেছেন। আল্লাহর হুকুম না হলে ভাসমানতার শক্তিও কাজ করবে না।

ফিরআউন আল্লাহ ও মুসা উভয়ের শত্রু। কারণ ফিরআউন নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করে সে আল্লাহর এককত্বকে ঔদ্ধত্যের সাথে অস্বীকার করে আল্লাহর শত্রু হয়েছে এবং ছেলে শিশুদেরকে হত্যার আদেশ দিয়ে সে শিশু মুসারও শত্রু হয়েছে। তাছাড়া যে আল্লাহর শত্রু সে অবশ্যই নবী-রসুলগণের ও বিশ্বাসীগণের শত্রু। সিন্দুকের ভিতর একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশুকে দেখে আল্লাহর ও শিশুটির শত্রু ফিরআউনের অন্তরে আল্লাহ নিজেই মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন - আয়াতের ভাষা থেকে তা স্পষ্ট। কারণ আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল যে, মুসা তার শত্রুর ঘরে আল্লাহরই কৃপাদৃষ্টিতে প্রতিপালিত হউন। ফিরআউনের নিজ ঘোষিত ছেলে-শিশু হত্যার আদেশের সে অন্যথা করতে পারে না। তাই আল্লাহ ফিরআউনের নিজের অন্তরে এবং তার স্ত্রীর অন্তরে এমন মহব্বত ঢেলে দিয়েছিলেন যে, সে তার নিজের ঘোষিত আইনের বাস্তবায়ন করতেও সক্ষম হয়নি বরং তারই প্রাসাদে রাজকীয় আদর-যত্নে মুসা (আঃ) লালিত পালিত হন।

পপরবর্তী আয়াতের তফসীর থেকে জানা যায় যে মুসা (আঃ)এর মা দূর থেকে সিন্দুকটির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তার মেয়েকে দরিয়ার পাড় ধরে অগ্রসর হতে বলেছিলেন। যখন ফিরআউন সিন্দুকটি থেকে মুসাকে নিয়ে তার প্রাসাদে যায় তখন মেয়েটিও কোন না কোনভাবে সেখানে পৌছতে সক্ষম হয়। শিশু মুসা যখন কোন দাত্রীর দুধ পান করছিল না তখন সে একজন ধাত্রীর খবর দিল যার দুধ হয়ত মুসা পান করবে। ফিরআউন সে ধাত্রীটিকে নিয়ে আসতে বলল। মেয়েটি তার মাকে নিয়ে আসল। মায়ের বুকে ধরার সাথে সাথে শিশুটি তৃপ্তির সাথে দুধ পান করছিল। এ দৃশ্য দেখে ফিরাআউন এবং তার স্ত্রী খূশী হল এবং মহিলাটিকে মুসার ধাত্রী হিসাবে নিয়োগ দান করল। আনন্দিত মুসার মা তখন অতি যত্নের সাথে নিজ ছেলেকে লালনপালন করতে লাগলেন।

(٢٤) ﴿ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشٰى ﴾

অর্থাৎ - আমি মুছার প্রতি এ মর্মে অহি করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাবার ভয় করো না ।

(১৬ নং পারা ঃ সুরা নং ২০ ঃ সুরা ত্বোয়া-হা ঃ রুকু নং ৩ ঃ আয়াত নং ৭৭)।

(٢٥) ﴿ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾

অর্থাৎ - অতঃপর ফিরআউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করল।

(১৬ নং পারা ঃ সুরা নং ২০ ঃ সুরা ত্বোয়া-হা ঃ রুকু নং ৩ ঃ আয়াত নং ৭৮)।

সুরা বাক্বারার ৫০ নং আয়াতের (১ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ব্যাখ্যায় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(٢٦) ﴿ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَ اِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ﴾

অর্থ – (মুসা আঃ) বললেন "দূর হ, তোর জন্য এ জীবনে (এ শাস্তিই) রইল যে, তুই বলবি, 'আমাকে স্পর্শ করো না' এবং অধিকন্তু (এক ভবিষ্যৎ শাস্তির জন্য) তোর ব্যাপারে একটি নির্দ্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যার তুই ছিলে এক উৎসর্গীকৃত পূজারী। আমরা সেটি জ্বালিয়ে দিবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দিবই।

(১৬ নং পারা ঃ সুরা নং ২০ ঃ সুরা ত্বোয়া-হা ঃ রুকু নং ৫ ঃ আয়াত নং ৯৭)।

মুসা (আঃ) ও বনিইসরাঈল যখন সমুদ্র পারি দিল তখন আল্লাহ তা'লা মুসা (আঃ)কে আদেশ করলেন তিনি যেন তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে চলে যান। সেখানে আল্লাহ তাকে তৌরাত দান করার ওয়াদা করলেন। মুসা (আঃ) তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং নিজে দ্রুত বেগে অগ্রে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তাদেরকে বলে গেলেন তার অনুপস্থিতিতে তারা যেন তার ভাই হারুন (আঃ) এর অনুসরণ করে । বনি ইসরাঈলরা হারুন (আঃ) এর সাথে পেছনে চলতে লাগল। কিন্তু পথিমধ্যে তাদের একদল সামেরী নামক এক কপট লোকের প্ররোচনায় গো-পূজায় লিপ্ত হয়ে গেল। এক রেওয়ায়েত অনুসারে সামেরী ছিল পারস্য অথবা ভারতবর্ষের এক গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক। মিসরে পৌছে সে মুসা (আঃ) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পুর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনি-ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

তূর পাহাড়ে পৌছলে আল্লাহ মুসা (আঃ)কে খবর দেন যে, বনি-ইসরাঈলরা পথিমধ্যে গো-পূজায় লিপ্ত হয়েছে। এ খবর পেয়ে মুসা (আঃ) তাদের কাছে ফিরে এলেন এবং তিনি সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন সে যেন কারও গায়ে হাত না লাগায়। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসা (আঃ)এর বদ-দোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত। এ ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত, " "আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।"

অতঃপর মুসা (আঃ) দৃঢ় কণ্ঠে সামেরীর ইলাহ সেই গো মূর্তিটিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে সাগরে ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয় ঘোষনা করলেন। এখানে কোন সাগরে

গো-মূর্তির ভস্ম ভাসিয়ে দেবেন সে কথা বলা হয়নি। সেটা সিনাই উপদ্বীপের কাছাকাছি সুয়েজ উপসাগর, আকাবা উপসাগর অথবা লোহিত সাগরও হতে পারে। কোরআনে বর্ণিত তূর পর্বতের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তূর পর্বত হতে বনি-ইসরাইলের অবস্থানে ফিরে এসে মুসা (আঃ) উপরিউক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। যদি তাদের অবস্থান মিশরের সিনাইয়ে হয়ে থাকে তবে সুয়েজ ও আকাবা উভয় উপসাগরই ঐ অবস্থানের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু তারা যেহেতু মিশর হতে লোহিত সাগর পারি দিয়ে পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন, তাই তূর পর্বত এবং তাদের সেই অবস্থানস্থল বর্তমান সৌদি আরবেও হতে পারে, কারণ প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ বর্তমান সৌদি আরবের উত্তর পশ্চিম অংশ সিনাই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুতরাং বনি ইসরাঈলের অবস্থানস্থল সৌদি আরবের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই ছিল এবং এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি তাই হয় তবে বনিইসরাঈলের অবস্থানস্থল লোহিত সাগর কিংবা আকাবা উপসাগরের নিকটবর্তী ছিল (চিত্র ৬)। স্বাভাবিকভাবে যে সাগরটি নিকটতর ছিল সেখানেই হয়ত মূতির ভস্ম ছড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়ে থাকতে পারে।

(২৭) ﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾

অর্থ – তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান জাহাজসমূহকে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন ? আর তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।

(১৭শ নং পারা ঃ সুরা নং ২২ হজ্জ ঃ রুকু নং ৯ ঃ আয়াত নং ৬৫)।

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ নিজ আদেশে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। সমুদ্রে চলমান জাহাজসমূহকেও আল্লাহ তাঁর নিজ আদেশে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষ যা কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা ভবিষ্যতে করতে পারবে তা আল্লাহর হুকুমেই করতে পারে বা পারবে। আল্লাহর হুকুম না থাকলে কোন কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসতে পারত না। ভূপৃষ্ঠে যে মানুষ চাষবাস করে ফসল উৎপাদন করে সেটা আল্লাহর হুকুমেই উৎপন্ন হয়। মাটিতে বীজ বপনের যে জ্ঞান মানুষ লাভ করেছে সেটাও আল্লাহরই দান। বীজ বপনের পর যে অঙ্কুরোদ্গম হয় সেটা তিনি না করলে হত না। অঙ্কুরোদ্গমের পর পাতা, ডাল ইত্যাদি যে উপরের দিকে উঠে এবং মূল যে নিচের দিকে যায় তাও আল্লাহর হুকুমেই হয়। মূল নিচের দিকে না গিয়ে এবং পাতা, ডাল ইত্যাদি উপরের দিকে না উঠলে গাছ হত না। মূল মাটি হতে পানি তুলতে না পারলে, পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে পাতায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকতে না পারলে, পাতায় ক্লোরোফিল না থাকলে কিংবা সূর্য্যালোক না পেলে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে গ্লোকোজ তৈরী করতে পারত না এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হত না। ফলে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী খাদ্য লাভ করতে পারত না কিংবা প্রশ্বাস নিতে পারত না। তখন পৃথিবীতে প্রাণধারণ করা সম্ভব হত না। পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করত না যদি আল্লাহ নির্দেশ না থাকত। মানুষ চাষবাসের জন্য যেসকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সেগুলো আল্লাহর হুকুমে ব্যবহৃত হয়। গবাদিপশু যে লাঙ্গল টানে, টানার সে শক্তি আল্লাহই তাকে দিয়েছেন, পশু যে মানুষের কথা মানে, সে মানার শক্তি আল্লাহই পশুকে দিয়েছেন। ট্রাক্টর, পাওয়া টিলার ইত্যাদি চলত না যদি আল্লাহর হুকুম না থাকত। সামনের দিকে টানার জন্য নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে যে শক্তি কাজ করে সেটাও আল্লাহর হুকুমেই করে। আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে সমুদ্রে যে জাহাজসমূহ ভাসে সেটাও আল্লাহর হুকুমেই হয়। কোন সূত্রই কাজ করবে না যদি আল্লাহ সেটাকে কার্যকরী না করেন। প্রকৃতি কিংবা প্রাকৃতিক বিধান কার্যকর হয় না আল্লাহর আদেশ না পেলে।

বায়ুমন্ডল ও বহিঃমহাশূণ্য বা বহিঃমহাকাশ(Outer space)সহ ভূপৃষ্ঠের উপর যা কিছু আছে এ সবকিছু মিলেই আসমান (Sky) বা জ্যোতিষ্কমন্ডলীয়

খিলান (Celestial dome)। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আসমানকে জ্যোতির্মন্ডল (Celestial sphere) বলা হয়।১৫ ভূপৃষ্ঠ হতে একে দেখতে একটি পৃথক খিলানের মত মনে হয় যার উপর সূর্য, নক্ষত্রমন্ডল, গ্রহমন্ডল ও চন্দ্র পরিদৃষ্ট হয়। এ আসমানকে আল্লাহ তা'লা স্থির করে রেখেছেন অর্থাৎ আসমানের জ্যোতিষ্কসমূহ পরস্পর হতে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যার যার কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে এবং ভূপৃষ্ট থেকে এদেরকে স্থির মনে হয় যেমন কিনা ঘূর্নায়মান পৃথিবীকে এর পৃষ্ঠে অবস্থানকারী মানুষ একে স্থির মনে করে। একইরূপে মোটামুটি একই গতিতে দুটি ট্রেন পাশাপাশি একই দিকে চলতে থাকলে উভয় ট্রেনের যাত্রীরা ট্রেন দুটিকে স্থির দেখতে পায়। এরূপে বিভিন্ন সৌর জগতের গ্রহসমূহ পরস্পর হতে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে নিজ নিজ কক্ষপথে নিজ নিজ নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে। আয়াতে জ্যোতিষ্কমন্ডলে পরিপূর্ণ আসমানকে স্থির বলা হয়েছে এ জন্য যে, যদি মহাকর্ষণের বলে এরা পরস্পরের দিকে ছুটে আসত তবে আমাদের পৃথিবীসহ মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত। আসমানের আপাত স্থিরতা আল্লাহর আদেশেই বজায় রয়েছে এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর করুণা ও দয়ার ফলেই আমরা ধ্বংস থেকে রক্ষা পাচ্ছি।

﴿اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ﴾ (২৮)

অর্থ - (অবিশ্বাসীদের অবস্থা) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপর ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে তখন তাকে একবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।

(১৮শ নং পারা ঃ সুরা নং ২৪ নূর ঃ রুকু নং ৫ ঃ আয়াত নং ৪০)।

গভীর সমুদ্রে ২০০ মিটার এবং তার চাইতে গভীরে অন্ধকার পরিলক্ষিত হয়। এ গভীরতায় আলো নেই বললেই চলে এবং ১০০০ মিটার গভীরতায় মোটেও কোন আলো নেই।১৬ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া মানুষ ৭০ মিটারের অধিক গভীরে ডুব দিতে পারে না। তারা কোন সাহায্য ছাড়া মহাসমুদ্রের ২০০ মিটারের মত অন্ধকারে বাঁচতে পারে না। এসকল কারণে বিজ্ঞানীরা কেবল সাম্প্রতিক কালে সমুদ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। অথচ গভীর সমুদ্র যে অন্ধকার সে কথা কোরআনে ১৪৩৯ বছর আগেই নাযিল হয়েছিল। এটা নিশ্চয়ই কোরআনের অলৌকিক ঘটনাবলীর একটি যে, এমন একটি জ্ঞানের কথা এমন এক সময় জানানো হয়েছিল যখন সমুদ্রের গভীরে ডুব দেয়ার মত মানুষের কোন যন্ত্রপাতিই ছিল না।

বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র সেদিন (১৯০৪ সালে) আবিষ্কার করেছেন যে, সমুদ্রের উপরি তলের (Sea surface) নিচেও ঢেউ সৃষ্টি হয় (চিত্র ৭)। এসকল আভ্যন্তরীন ঢেউ সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের গভীর পানিকে ঢেকে রাখে কারণ গভীর পানির ঘনত্ব এর উপরের পানির ঘনত্ব হতে বেশী। উপরিতলের পানির ঢেউয়ের মতই আভ্যন্তরীন ঢেউগুলো ক্রিয়া করে থাকে।১৭ এরা ঠিক উপরিতলের ঢেউগুলোর মতই আচড়ে পড়ে। এগুলো মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সমুদ্রের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পরিবর্তনের পরীক্ষা দ্বারা এদেরকে শনাক্ত করা যায়। আভ্যন্তরীন ঢেউ ৫০০ মিটারের অধিক উচ্চ হতে পারে।

আলোহীন গভীর অন্ধকারময় সমুদ্রেও প্রাণী বাস করে । এদের চোখগুলি খুব ছোট থাকে। এদের নিজস্ব আলোকঅঙ্গ থাকে যা জ্বালিয়ে এরা চলাফেরা করতে পারে। সমুদ্রের গভীর তলদেশে পানির চাপ এত বেশী যে যদি কোন মানুষ চাপনিরোধী কোন পোশাক না পরে সেখানে যায় তবে চেপ্টে একটি মাংসপিন্ড হয়ে যাবে। সেখানেও অক্সিজেন আছে। সমুদ্রের পানির উপরে নিচে উঠানামার কারণে ও সবসময় পানির নড়াচড়ার কারণে গভীর সমুদ্রের

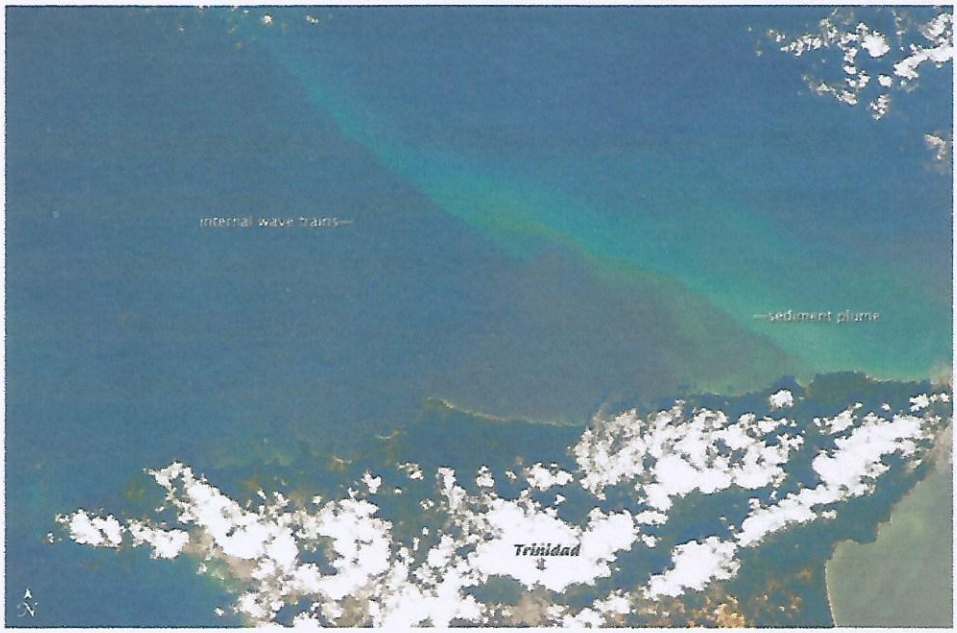

চিত্র নং ৭। আভ্যন্তরীন (Internal) বা পৃষ্ঠতলগর্ভস্থ (Subsurface) ঢেউ

পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হতে পারে।

অন্ধকারময় সমুদ্রের আভ্যন্তরীন ঢেউয়ের উপরে সমুদ্রের উপরিতলের ঢেউ আন্দোলিত হয় এবং তার উপর ভেসে বেড়ায় কালো মেঘ। অবিশ্বাসীদের অবস্থাও তেমনি অন্ধকারময়। তারা অবিশ্বাসের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। আল্লাহর হেদায়েতের নূর না পেলে তারা চিরঅন্ধকারে হাতরাতে থাকবে কিন্তু পথ পাবে না।

﴿وَ هُوَ الَّذِیْ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ (২৯)

অর্থ - তিনিই সমান্তরালে দু সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটা মিষ্টি, তৃষ্ণানিবারক ও এটা লোণা, বিস্বাদ ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দূর্ভেদ্য আড়াল।

(১৮-১৯শ নং পারা ঃ সুরা নং ২৫ ফোরক্বান ঃ রুকু নং ৫ ঃ আয়াত নং ৫৩)।

নদীর মোহনা (Estuary) হতে মিঠা পানির স্রোত যখন সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন সমুদ্রের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। সমুদ্রের লোণা পানি হতে নদীর মিঠা পানির ঘনত্ব কম হওয়ায় মিঠা পানি সামুদ্রিক পানির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তখন সমুদ্রের লোণা পানি ও নদীর মিঠা পানি পরস্পর সমান্তরালে প্রবাহিত মনে হয়। এ দুয়ের মাঝে পরিষ্কার একটি অন্তরায় থাকে যা পিকনোক্লাইন (Pycnocline) নামে পরিচিত। পিকনোক্লাইন একটি ক্রমিতাবিহীন (Discontinous) ঘনত্ববিশিষ্ট (marked) অঞ্চল (Zone) যা মিঠাপানি হতে লবণপানিকে পৃথক করে রাখে অর্থাৎ পিকনোক্লাইন অঞ্চলের ঘনত্ব মিঠাপানি ও লবণপানির ঘনত্ব হতে ভিন্ন। ইহাকেই কোরআনে অন্তরায় ও দুর্ভেদ্য আড়াল বলা হয়েছে।

(৩০) ﴿فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ﴾

অর্থ - অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, "তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর।" ফলে সেটা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ্য হয়ে গেল।

(১৯ নং পারা ঃ সুরা নং ২৬ শু'আরা ঃ রুকু নং ৪ ঃ আয়াত নং ৬৩)।

মুসা (আঃ) আল্লাহর আদেশে তার হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করলেন, এবং এর ফলে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে কতগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে শুষ্ক পথ তৈরী হয়ে গেল। প্রত্যেক পথের দুপাশে সমুদ্রের পানি বিশাল পর্বতের মত দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তা'লা মুসা (আঃ) এর দলের বিভিন্ন গোত্রকে বিভিন্ন শুষ্ক পথের মাধ্যমে লোহিত সাগরের অপর পাড়ে পৌছে দিলেন। এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে সুরা বাক্বারার ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে (১ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

কোরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে আল্লাহর আদেশে মুসার লাঠির দ্বারা সমুদ্রকে বিভক্ত করে এর মধ্যে শুষ্ক রাস্তা তৈরী করা ছিল আল্লাহর একটি বিশেষ মোজেজা বা অলৌকিক ব্যাপার। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে যে লোহিত সাগরে ভাঁটার সময় এর যে অংশ শুকিয়ে যেত সে পথেই হয়ত মুসা (আঃ) সাগর পারি দিয়েছিলেন। কিন্তু শুষ্ক রাস্তা তৈরী করার জন্য লাঠির আঘাতের কি প্রয়োজন ছিল? আসলে এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই যা ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে।

(৩১) ﴿اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থ - অথবা কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন ও এর মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং এর জন্য অনড় পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দু সমুদ্রের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা রেখেছেন ? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

(২০ নং পারা ঃ সুরা নং ২৭ নাম্‌ল ঃ রুকু নং ৫ ঃ আয়াত নং ৬১)।

মহাশূন্যে যত গ্রহ-নক্ষত্র আছে তন্মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই জীবজগতের জন্য বসবাসযোগ্য। এখনও এমন কোন গ্রহ-নক্ষত্র আবিস্কৃত হয়নি যাতে মানুষ ও অন্যান্য জীব সহজে ও স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। পার্থিব জীবন ধারণের জন্য পানি ও অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনধারনোপযোগী পরিমাণ পানি ও অক্সিজেন এখন পর্যন্ত অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রে পাওয়া যায়নি। পৃথিবীতে যদিও এনাএরোবিক (Anaerobic) ব্যাক্টেরিয়াসমূহ অক্সিজেন ব্যতিরেকে জীবনধারণ করতে পারে তবু পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, কারণ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরের শতকরা ৭০-৮০ ভাগই পানি। সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহের চতুর্দিকে কোন ওজন (Ozone) স্তর নাই। এ ওজন স্তর সূর্য হতে আগত অতি বেগুনী রশ্মির মত মারাত্মক (Fatal) রশ্মিগুলো আটকিয়ে রাখে। ফলে এসব রশ্মি পৃথিবী পর্যন্ত পৌছতে পারে না। যদি পৌছতে পারত তবে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। অন্যান্য সৌরজগতের গ্রহগুলোর চতুর্দিকে এরূপ কোন গ্যাস স্তর নাই যার দ্বারা ঐ নক্ষত্রের মারাত্মক রশ্মিগুলোকে প্রতিরোধ করা যায়। ফলে ঐসব সৌরজগতেও স্বাভাবিক জীবন ধারণ অসম্ভব। পৃথিবীর মধ্য দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী প্রবাহিত করে একে সিক্ত ও নদীপথে গমনাগমনের উপযোগী করে রাখা হয়েছে, ফলে নদীর আশেপাশে বসতি স্থাপন, চাষাবাদ ও দেশদেশান্তরে ব্যবসাবাণিজ্য করার ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। নদীতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপাদন করে মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নদ-নদী, বিভিন্ন জলাশয় ও সাগরের পানির বাষ্পীভবন ও পরে ঘনীভবনের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের দ্বারা

পানিচক্রের সৃষ্টি করে পৃথিবীকে সবুজ সতেজ রাখা হয়েছে।

পৃথিবীর বাইরের কঠিন অংশ (Earth's crust) গঠনকারী গুরুভার ধাতুফলকসমূহের (Massive plates) চলন (movements) ও সংঘর্ষণের (collisions) ফলে পর্বতমালা সৃষ্ট হয়। যখন দুটি ধাতুফলকের মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন অপেক্ষাকৃত কঠিনতরটি অপরটির নীচে পিছলিয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং তখন উপরেরটি বাঁকা হয়ে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি করে । নিচের স্তরটি মাটির নিচের দিকে অগ্রসর হয়ে একটি গভীর প্রসারণের সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ ভূমির উপরে দৃষ্ট পর্বতটির মতই দীর্ঘ অথবা এর চাইতে দীর্ঘ এরই নিম্নদিকে প্রসারিত একটি অংশ গঠিত হয়। সে অংশটিকে পর্বতটির মূল (Root) বলা হয় (চিত্র ৮)। "আর্থ" (Earth) শিরোনামযুক্ত একখানি বই বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক উল্লেখযোগ্য পাঠ্যবই হিসাবে ব্যবহৃত হয়।১৮ উক্ত বইয়ের দুজন লেখকের মধ্যে একজন হলেন ভূতাত্ত্বিক পদার্থবিদ প্রফেসার এমেরিটাস ফ্রেঙ্ক প্রেস। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্ট ছিলেন এবং ১২ বছর ধরে ওয়াশিংটন ডি. সি.এর ন্যাশনাল একাডেমি অব সাইন্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে পর্বতমালার নিচে মূল রয়েছে। অপর একজন লেখক টেরি এ হিক্সের লিখা "হাও ডু মাউনেইনস ফর্ম"

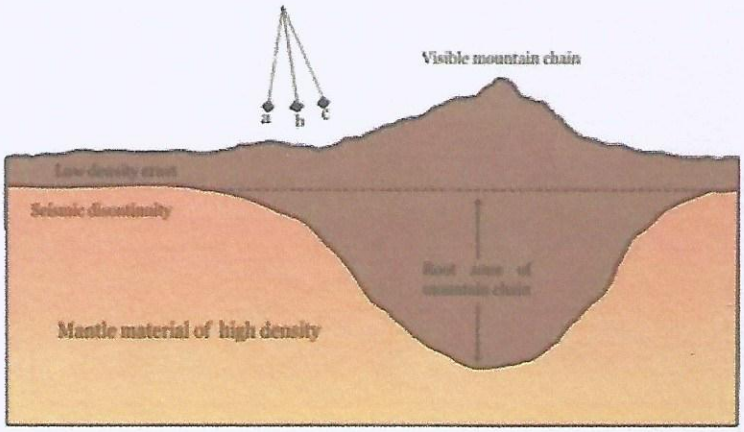

চিত্র নং ৮। পর্বতমূল (Mountain root)

বইয়ের মতেও পর্বতমালার নিচে গভীর মূল রয়েছে।১৯ অন্যান্য আরও বহু সূত্র থেকেও জানা যায় যে পর্বতমালার নিচে মূল রয়েছে। ভূতাত্ত্বিকগণের মতে ৩-৪ মাইল উচ্চ একটি পর্বত পৃথিবী র চতুপার্শ্বস্থ মেন্টেলের ভিতর একটি ৩০-৪০ মাইল গভীর মহাদেশীয় কঠিন অংশের (Continental crust) দ্বারা সৃষ্ট একটি মূলের গঠন উদ্গত করতে পারে । বিজ্ঞানী কেইলিয়াক্স (Cailleux)এর মতে পর্বতমূলের স্তম্ভদন্ডটি(Shaft) উপরিস্থিত পর্বতের ভার বহনের কাজ করে থাকে এবং এর দ্বারা একটি সাম্যাবস্থা (Equillibrium) ২০ অথবা ভূতাত্ত্বিকদের মতে একটি আইজসটেসি (Isostasy) প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পর্বতমূলের দ্বারা পর্বতটি অনড় হয় এবং উপরিউক্ত আয়াতে এ অনড় পর্বতের কথাই বলা হয়েছে এবং পর্বতের অন্য কোন কাজের কথা বলা হয়নি। ভূমধ্যসাগরের পানি আটলান্টিক মহাসাগরের পানি হতে তুলনামূলকভাবে উষ্ণ, লবণাক্ত ও কম ঘন। ভূমধ্যসাগরের পানি যখন জিব্রাল্টার প্রণালীর উপর দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে তখন এটি প্রায় ১০০০ মিটার গভীরতায় তার নিজস্ব উষ্ণ, লবণাক্ত ও কম ঘন বৈশিষ্ট্যের পানি নিয়ে আটলান্টিকের মধ্যে কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় পানি এ গভীরতায় স্থিরতা ও স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু মহাসাগরীয় পিকনোক্লাইন (Pycnocline)) নামক প্রতিবন্ধকতার কারণে আটলান্টিকের পানির সাথে মিশে যায় না। এখানে দু সমুদ্রের মাঝে এ প্রতিবন্ধকতার

কথাই বলা হয়েছে (চিত্র ৯)। একইভাবে বিভিন্ন মহাসাগরীয় পানির উষ্ণতা, লবনাক্ততা ও ঘনত্বের বিভিন্নতার কারণে এদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়, এমনকি একই মহাসাগরের উপরের ও নীচের পানির এসব বৈশিষ্টের মধ্যে পার্থকের কারণে অন্তরায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

"আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি ?" – এর অর্থ অন্য কোন ইলাহ কি এ কাজ করতে পারত অথবা তিনি ভিন্ন আর কে উপাসনার যোগ্য আছে ?

"বরং তাদের অধিকাংশই জানে না !" - এর অর্থ তারা জানে না বলেই তাদের অধিকাংশ অন্য দেব-দেবীর পূজা করে।

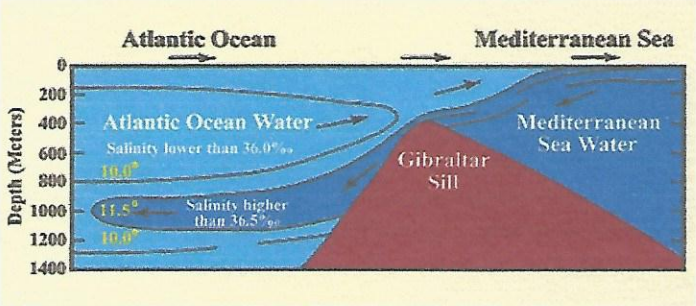

চিত্র নং ৯। ভূমধ্য সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থ পিকনোক্লাই (Pycnocline)

(٣٢) ﴿ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًام بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّايُشْرِكُوْنَ ﴾

অর্থ – অথবা কে তোমাদেরকে জল ও স্থলের অন্ধকারে পথ দেখান এবং কে তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন ? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্দ্ধে।

(২০ নং পারা ঃ সুরা নং ২৭ নাম্‌ল ঃ রুকু নং ৫ ঃ আয়াত নং ৬৩)।

আল্লাহ তা'লা রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্রের সাহায্যে জলে ও স্থলে মানুষকে দিক নির্ণয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দিনের বেলায় স্থলের বিভিন্ন চিহ্ন (Land marks) দেখে এবং সূর্যের উদয় ও অস্তের দিক দেখে মানুষ দিক নির্ণয় করতে পারে। বায়ু প্রবাহ আল্লাহর অনুগ্রহ বৃষ্টি আসার পূর্ব লক্ষণ দ্রুত বলে দেয়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দিক নির্ণয়ের জন্য নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে । এখন এগুলোর সাহায্যে সহজে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে দিক নির্ণয় করা যায়। আধুনিক জাহাজে দিক নির্ণয়ের জন্য গাইরো কম্পাস (Gyro Compass), মেগনেটিক কম্পাস (Magnetic Compass), অটোমেটিক রাডার প্লটিং এইড বা আরপা (Automatic Radar Plotting Aid or ARPA), অটোমেটিক ট্রেকিং এইড (Automatic Tracking Aid), ইলেক্ট্রনিক চার্ট ডিসপ্লে ইনফরমেশন সিস্টেম বা ইসিডিআইএস (Electronic Chart Display Information System or ECDIS) ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। স্থলে ও অন্তরীক্ষে দিক নির্ণয়ের জন্য আধুনিক কম্পাস ও ভিওআর (VOR = Very High Frequency Omni Directional Range) ব্যবহৃত হয়।

বায়ুপ্রবাহ (যেমন উত্তর গোলার্দ্ধে মৌসুমী বায়ু প্রবাহ) আল্লাহর অনুগ্রহ বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ। উত্তর গোলার্দ্ধে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় তা ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় তা জলীয় বাষ্প বহন করে উত্তর পূর্ব দিকের পাহাড় পর্বতের গাত্রে বাধা প্রাপ্ত হয় ও উপরের দিকে উঠে যায় এবং উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে আল্লাহর রহমত হিসেবে বৃষ্টিরূপে (Precipitation) ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। সুতরাং এখানে মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ বৃষ্টির সুসংবাদবাহীরূপে কাজ করে। তা ছাড়া আরব বণিকরা নৌপথে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ হয়ে সম্ভবতঃ মালাক্কা প্রণালী দিয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর

অপেক্ষায় থাকত (চিত্র ১০)।

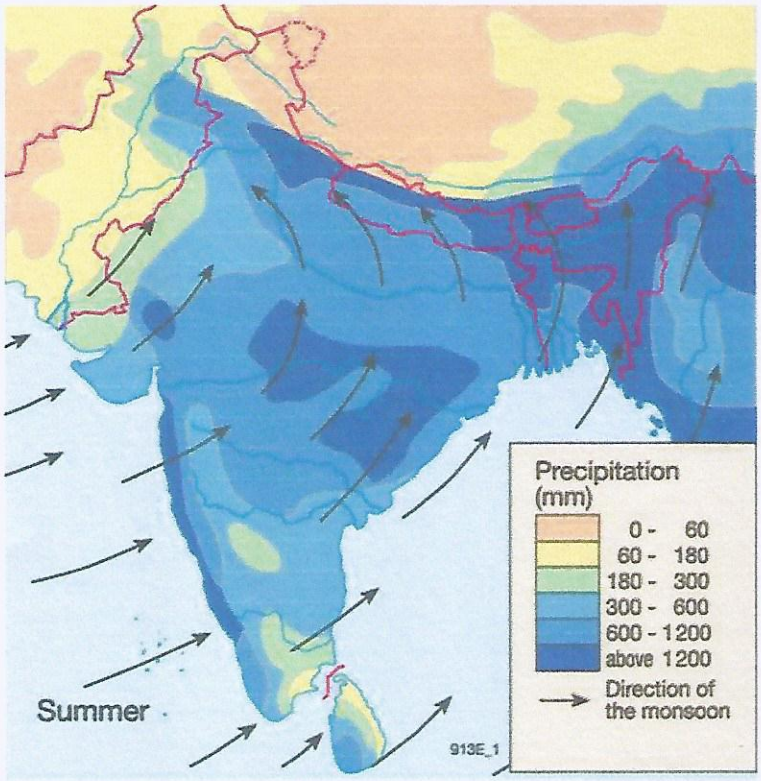

চিত্র নং ১০। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের দিক

এ বায়ু প্রবাহের শুরূ তাদের জন্য একাটি সুসংবাদস্বরূপ ছিল। একইভাবে চীন হতে ভারতবর্ষ হয়ে দেশে ফেরার জন্য তারা উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করত এবং এ বায়ু প্রবাহের শুরুও তাদের জন্য সুসংবাদবাহী ছিল। এ মৌসুমী বায়ু একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই প্রবাহিত হয়। কোন দেব-দেবী একে প্রবাহিত করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং উপাস্য একমাত্র আল্লাহই। কাফেররা তাঁর সাথে যেসকল দেব-দেবী শরীক করে তিনি ঐগুলি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং উর্দ্ধে।

﴿(٣٣) وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِىْ وَ لَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾

অর্থ – আমি মুসা-জননীকে (এ) আদেশ পাঠালাম, "তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব।"

(২০ নং পারা ঃ সুরা নং ২৮ ক্বাছাছ ঃ রুকু নং ১ ঃ আয়াত নং ৭)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুসা (আঃ) এর জন্মের পর তার মাকে দুধ পান করিয়ে যেতে আদেশ করছেন এবং ফিরআউনের লোকদের আগমনের আশংকা হলে তাকে সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দিতে উপদেশ দিচ্ছেন। এ কারণে তার মাকে তার জন্য ভয় কিংবা দুঃখ করতে নিষেধ করছেন, কারণ আল্লাহ তাকে তারই কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে তাকে নবীগণের অন্তর্ভূক্ত করবেন বলেও আশ্বাস দিচ্ছেন।

ঘটনাটি ইতিপূর্বে সুরা ত্বোয়া-হা এর ৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে যখন মুসা (আঃ)এর মা সিন্দুকে ভরে তার শিশু সন্তানকে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তখন সে দূর থেকে সিন্দুকটির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তার মেয়েকে দরিয়ার পাড় ধরে অগ্রসর হতে বলেছিলেন। যখন ফিরআউন তার রাজ-প্রাসাদের ঘাটে ভিড়া সিন্দুকটি হতে মুসাকে তুলে নিয়ে তার প্রাসাদে যায় তখন মেয়েটিও কোন না কোনভাবে সেখানে পৌছতে সক্ষম হয়। শিশু মুসা যখন কোন দাত্রীর দুধ পান করছিল না তখন সে একজন ধাত্রীর খবর দিল যার দুধ হয়ত মুসা পান করতে পারে। ফিরআউন সে ধাত্রীটিকে নিয়ে আসতে বলল। মেয়েটি তার মাকে নিয়ে আসল। মায়ের বুকে ধরার সাথে সাথে শিশুটি তৃপ্তির সাথে দুধ পান করছিল। এ দেখে ফিরাআউন এবং তার স্ত্রী খূশী হল এবং মহিলাটিকে মুসার ধাত্রী হিসাবে নিয়োগ দান করল। আনন্দিত মুসার মা তখন অতি যত্নের সাথে নিজ ছেলেকে লালনপালন করতে লাগলেন। এভাবে আল্লাহ মুসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে পয়গম্বরগণের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন।

(٣٤) ﴿ فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴾

অর্থ - অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে ।

(২০ নং পারা ঃ সুরা নং ২৮ ক্বাছাছ ঃ রুকু নং ৪ ঃ আয়াত নং ৪০)।

ইতিপূর্বে ২৬ নং সুরা শু'আরায় আল্লাহ তা'লা বর্ণনা করেছেন কিভাবে তিনি ফিরআউনকে ও তার বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। একই কথা এখানেও একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন যে, তিনি ফিরআউনকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছেন। সাধারণতঃ কেহ কারও উপর ভয়ানক রাগান্বিত হলেই কেবল সে তাকে জবরদস্তি করে ধরে সমুদ্রে (পানিতে) নিক্ষেপ করতে পারে। রাজাধিরাজ মহাশক্তিধর আল্লাহ যুগে যুগে সীমালঙ্ঘনকারী রাজা বাদশাদেরকে এমনিভাবে ধরেছেন এবং খতম করেছেন। কাউকে অন্য রাজশক্তি দ্বারা, কাউকে সামান্য ক্ষুদ্র মশা দ্বারা (যেমন নমরূদকে), কাউকে ভূমিকম্প দ্বারা (সামুদ জাতির অংশবিশেষকে), কাউকে প্রলংয়কর বজ্র ও বিদ্যুতপাত দ্বারা (যেমন সামুদ জাতিকে), কাউকে প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা (যেমন আদ জাতিকে), আবার কাউকে কাউকে ঝড়- তুফানের দ্বারা (যেমন নূহ আঃ এর কওমকে) এবং কাউকে অজ্ঞাত রোগ দ্বারা (যেমন মহাবীর আলেক্সাডারকে সামান্য জ্বরের দ্বারা) ধ্বংস করেছেন। এটাই সীমালঙ্ঘনকারীদের স্বাভাবিক পরিণতি এবং আখেরাতেও তারা জাহান্নামের চির শাস্তি ভোগ করবে।

(٣٥) فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۔

অর্থ - ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে ; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদিগকে উদ্ধার করেন তখন ওরা তাঁর শরীক করে।

(২১ নং পারা ঃ সুরা নং ২৯ আন্কাবুত ঃ রুকু নং ৭ ঃ আয়াত নং ৬৫)।

পূর্বের যুগে কাফের-মুশরিকরা যখন নৌকা অথবা জাহাজে আরোহণ করে দরিয়া অথবা সাগরে যাত্রা করত তখন তারা বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একনিষ্ঠভাবে ও বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকত, কারণ তারা ভাল করেই জানত যে, তাদের দেবদেবী তাদেরকে দরিয়া অথবা সামুদ্রিক বিপদাপদ হতে উদ্ধার করে আনতে পারত না । সমুদ্রে মাছ ধরা কিংবা ব্যবসাবাণিজ্য সেরে যখন ফেরৎ আসত তখনও তারা একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে ডেকে আসত । অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে সামুদ্রিক বিপদাপদ (যথা - ঝড়-তুফান,সাইক্লোন, সুনামি, প্রবল বায়ু প্রবাহ, বিশালাকার ঢেউ, সমুদ্র স্রোত ইত্যাদি) হতে সহিসালামতে স্থলে ভিড়িয়ে আনতেন তখন তারা আবার শয়তানের প্ররোচনায় বিশ্বাস করতে থাকে যে, তারা অমুখ অমুখ দেবদেবীর অসিলায় সহিসালামতে ফিরে আসতে পেরেছে। এখনও কাফেরমুশরিকরা একইভাবে জলযানে চড়ে একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করে সমুদ্র যাত্রা করে কিন্তু ফিরে এসে দেবদেবীর পূজায় রত হয়। সেজন্যই আল্লাহতা'লা মানুষকে তাঁর প্রতি অবশ্যই অবশ্যই অকৃতজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশের বঙ্গোপসাগরে জেলেরা মাছ ধরতে যাবার সময় নৌকাতে আরোহণ করে বদর বদর বলতে বলতে যাত্রা করত। চট্টগ্রামে বদর শাহ নামক এক অলি-আল্লাহ ছিলেন। জেলেরা বিশেষ করে হিন্দু জেলেরা বিশ্বাস করত যে তার নাম নিয়ে নৌকা ছাড়লে সামুদ্রিক বিপদাপদ পড়তে হয় না। এটাও এক ধরনের শিরক কারণ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না।

(৩৬) ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴾

অর্থ – স্থলে ও সমুদ্রে (জলে) মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।

(২১ নং পারা ঃ সুরা নং ৩০ রূম ঃ রুকু নং ৫ ঃ আয়াত নং ৪১)।

মানুষ পাপ করলে তার ফলস্বরূপ স্থলে ও জলে বিপর্যয় হয়। স্থলে ভূমিকম্প, বর্জপাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি , অতি উত্তাপ, অতিশৈত্য, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ, ঝড়তুফান, রোগব্যাধি ইত্যাদি এবং জলে জলোচ্ছাস, ঝড়, অতি লবণাক্ততা, বিশাল বিশাল ঢেউ, ভয়ঙ্কর স্রোত, সমুদ্রতলদেশে ভূকম্পন, সাগরে বিশাল বিশাল বরফখন্ডের সাথে সংঘর্ষে জাহাজডুবি, জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ এবং সুনামির মত জলোচ্ছাস ও এসকল কারণে বাড়ীঘর, জানমাল এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিপর্যয় ঘটে মানুষের নানা প্রকার পাপের দরুন। এসকল পাপের মধ্যে আল্লাহ ও রসুলে অবিশ্বাস, কুফুরি, যিনা, সূদ, ওজনে কম দেয়া, মাপে বেশী নেয়া, মিথ্যা, পায়ুকামিতা, মদ, জুয়া , গালিগালাজ, অন্যায়ভাবে মারামারি ও খুনাখুনি, দুর্বলের উপর সবলের জুলুম, রাহাজাতি, চুরি, যাদু ইত্যাদিসহ আরো নানা পাপকর্ম। এসকল পাপকর্মের ফলে কিভাবে উপরিউক্ত বির্পয়সমূহ ঘটে তার কোনও ব্যাখ্যা অবশ্য সরাসরি দেয়া হয়নি। তবে তফসীরবিদগণ বিভিন্নভাবে এসবের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষ এমন কিছু অপকর্ম করছে যার কারণে প্রকৃতির ভারসাম্যে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে। আল্লাহ তা'লা প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সুন্দর ভারসাম্য স্থাপন করে দিয়েছেন যা ঠিক থাকলে সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলে। কিন্তু এ ভারসাম্যে কোন কৃত্তিম পরিবর্তন ঘটালে কোন কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলে না। মানুষ বিজ্ঞানের সুন্দর সুন্দর আবিষ্কারগুলোর অপব্যবহার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্যগুলো বিনষ্ট করছে। যার ফলে এ ধরণী ক্রমান্নয়ে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। পৃথিবীর চতুর্দিকে একটা ওজন (O3) গ্যাসের স্তর রয়েছে এবং এটা ভেদ করে সূর্যের মারাত্মক রশ্মিগুলো পৃথিবীতে পৌছতে পারে না । এসকল মারাত্মক রশ্মি জীবজগৎকে ধ্বংস করে দিতে পারত। তাই আল্লাহ তা'লা এ স্তর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যদি কোন কারণে এ স্তরে কোন ফাটল ধরে কিংবা ছিদ্র হয়ে যায় তবে পৃথিবীর জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কিছু কিছু গ্যাস আছে

যেগুলো পরিমাণমত পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে না থাকলে পৃথিবী সূর্য্রের উত্তাপ ধরে রাখতে পারবে না। ফলে পৃথিবী এমন শীতল হয়ে যাবে যে এতে জীবজগতের জীবন ধারণ সম্ভব হবে না। কিন্তু বায়ুমন্ডলে এসকল গ্যাস পরিমাণের অতিরিক্ত হলে পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌছবে যে এতে জীবন ধারণ সম্ভব হবে না। যেসকল গ্যাসের পরিমাণাতারিক্ত নির্গমণের ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ছে সেকল গ্যাসকে এক কথায় গ্রীনহাউজ গ্যাস (Greenhouse gases) বলে। শীতপ্রধান দেশে অতিরিক্ত শীতের কারণে অঙ্কুরোদ্গম করা কিংবা চারা গাছ বাঁচানো সম্ভব হয় না। তাই বড় বড় কাঁচের ঘর তৈরী করে সেগুলোর ভিতর অঙ্কুরোদ্গম করা হয় এবং চারার চাষ হয়। এগুলোকে গ্রীনহাউজ বলা হয়। কাঁচ সূর্যের উত্তাপ ধরে রাখতে পারে এবং গ্রীনহাউজ গরম থাকে। একইভাবে গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলোর অনুসমূহ সূর্যের তাপ ধরে রেখে পৃথিবীপৃষ্ঠ ও সমুদ্রের জলরাশি উত্তপ্ত করতে পারে। এসকল গ্যাস হল প্রধানত জলীয় বাষ্প, মিথেন, ওজন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বনডাই অক্সাইড এবং ফ্লোরিন জাতীয় (Flourinated gases) গ্যাস । মানুষের শিল্পনির্গত গ্রীনহাউজ গ্যাসসমূহ এবং প্রধানতঃ জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের কারণে ও বননিধনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা ব্যাপক হারে বেড়েছে। গত এক শত বছরে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রীনহাউজ গ্যাস ভূপৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা ০.৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট) বৃদ্ধি করেছে ; বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ছাড়াও সামুদ্রিক অম্লাক্তকরণ, কুজ্ঝটিকা-ধূম্র (Smog) কলুষিতকরণ, ওজন-স্তর (Ozone layer) বিনাশসাধন, উদ্ভিদ-বর্ধন এবং পরিপুষ্টিতে পরিবর্তন সাধন হয় । এসকল গ্যাসের ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। ব্যাপক শিল্প কারখানা গড়ে উঠার ফলে ব্যাপক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিম্নলিখিত বিভিন্নভাবে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে :

১) মরুআয়ন (Desertification)।

২) বর্ধিত বরফ তরলিকরণ (Increased melting of snow)।

৩) সমুদ্র তলের স্বাাভাবিক উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ (Sea level rise)।

৪) প্রবলতর ঝড় প্রবাহ এবং চরম ঘটনাবলীর সংঘটন (Stronger storms and happening of extreme events) ।

মানুষ কর্তৃক স্থাপিত বড় বড় শিল্প-কারখানা হতে মিথেন ও নাইট্রাস এসিড নির্গমনের ফলে বায়ুতে ওজন গ্যাসের ঘনীভবন দ্বিগুন বেড়েছে। ভূপৃষ্ঠের সমতলে ওজন একটি বায়ুদূষক (air pollutant) গ্যাস এবং এটা কুজ্ঝটিকা-ধূম্রের (Smog) প্রধান উপাদান। কুজ্ঝটিকা-ধূম্র মানুষ ও উদ্ভিদ উভয়ের জন্য ভয়াবহ। দীর্ঘকাল ধরে ওজন গ্যাসের সংস্পর্শে অবস্থান করলে আয়ু কমে। আধুনিক গবেষনায় দেখা গেছে যে ওজন গ্যাসের সংস্পর্শে থাকার কারণে সোয়াবিন, ভূট্টা, গম ইত্যাদির মত প্রধান শস্যাদির ফলন ২-১৫% কমে গেছে। বায়ুমন্ডলের ওজন স্তর ধ্বংসকারী প্রধান গ্যাস হল নাইট্রাস অক্সাইড ; এ ছাড়াও CFCs (Chlorofluorocarbons)ও অন্যান্য অনেক গ্যাস রয়েছে যেগুলো ওজন গ্যাসের স্তর বিনষ্ট করে। সমুদ্রের পানির স্বাভাবিক উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে কালে বাংলাদেশসহ অনেক দেশ পানির নিচে ডুবে যাবে। খাদ্যশস্যের অভাবে অনাহার, অপুষ্টি ও মৃত্যুর হার বাড়বে। পানির অভাবে এবং মরুভূমি অঞ্চল আরও শুষ্ক হয়ে মরুআয়ন হবে। পরিবেশ অধিকতর দূষিত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হবে এবং এলার্জি, এজমা ইত্যাদি রোগ ব্যাপক হবে। যুদ্ধ বিগ্রহে আধুনিক ও রাসানিক অস্ত্রের ব্যাপক ব্যাবহার ও পারমানবিক অস্ত্রের প্রয়োগ আধুনিক সভ্যতার স্থাপনাসমূহসহ কোটি কোটি মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধ্বংস হচেছ এরং হবে। মারণাস্ত্রের তীব্র বিষাক্ততা স্থল, জল(সমুদ্র) ও অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে পড়বে। এসবই মানুষের কর্মের ফল। এরূপে আল্লাহ মানুষকে তার কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান যাতে করে সে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে।

﴿ وَ لَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ یَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ﴾ (৩৭)

অর্থ - পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২১ নং পারা ঃ সুরা নং ৩১ লোকমান ঃ রুকু নং ৩ ঃ আয়াত নং ২৭)।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'লার কথা তথা বাক্যাবলী র কোন শেষ নেই। তাঁর আদেশ-নির্দেশ ও উপদেশসম্বলিত বাক্যাবলী লিখতে গিয়ে যদি সারা বিশ্বের সকল উদ্ভিদ কেটে কলম বানানো হয় এবং সকল সমুদ্রের পানি দিয়ে কালি বানানো হয় তবু তাঁর কথা লিখে শেষ করা যাবে না। সমুদ্রের কথা বলতে গিয়ে সাত সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর উপরিভাগের প্রায় ৭১% পানি এবং এতে পাঁচটি মহাসমুদ্র রয়েছে । সেগুলি হল - ১) প্রশান্ত মহাসাগর, ২) আটলান্টিক মহাসাগর, ৩) ভারত মহাসাগর, ৪) আর্কটিক মহাসাগর এবং ৫) দক্ষিণ মহাসাগর। মহাসাগরসমূহের এ আধুনিক হিসেবের পূর্বে বিশ্বের বৃহত্তম পানির অঞ্চলসমূহকে "সাত সমুদ্র" দ্বারা আখ্যায়িত করা হত।২১ সেগুলো হল -

১) প্রশান্ত মহাসাগর,

২) আটলান্টিক মহাসাগর,

৩) ভারত মহাসাগর,

৪) আর্কটিক মহাসাগর,

৫) ভূমধ্য সাগর,

৬) ক্যারিবীয় সাগর এবং

৭) মেক্সিকো উপসাগর ।

নতুন এক হিসেব মতে (২০১৬) পৃথিবীর বৃক্ষের সংখ্যা প্রায় "তিন ট্রিলিয়ন" ।২২ আধুনিক হিসেব মতে পৃথিবীতে ৩৯১,০০০ প্রজাতির রসনালীপূর্ণ (Vascular) উদ্ভিদ রয়েছে। যুক্তরাজ্যের কিউয়ে অবস্থিত রয়েল বুটানিক গার্ডেনের (Royal Botanic Garden) এক রিপোর্ট মোতাবেক এদের মধ্যে প্রায় ৩৬৯,০০০ প্রজাতি (৯৪%) পুষ্পিত উদ্ভিদ ।

এক হিসেব মতে পৃথিবীপৃষ্ঠের পানির আয়তন ১.৩৮৬ বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার (৩৩৩ মিলিয়ন ঘন মাইল)। এর মধ্যে ৯৭.৫% লোণা পানি এবং ২.৫% মিঠা পানি। মিঠা পানির মাত্র ০.৩% তরল অবস্থায় আছে। পৃথিবীতে পানির পরিমাণ ৩২৬ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্যলনেরও বেশী।

তিন ট্রিলিয়ন বৃক্ষের কান্ড ও ডালপালা দিয়ে কলম বানিয়ে ৩২৬ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্যালন পানি দিয়ে কালি বানিয়ে এদের দ্বারা আল্লাহর বাক্যাবলী লিখলেও তাঁর বাক্যাবলী লিখে কখনও শেষ করা যাবে না। এটা শুধু অনুমান করার জন্য উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আসলে মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কথার কোন শেষ নাই।

(৩৮) ﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴾

﴿ وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴾

অর্থ – তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন ? নিশ্চয়ই

এতে প্রত্যেক সহনশীল কৃতজ্ঞ ব্যাক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

যখন তাদিগকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয় তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদিগকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

(২১ নং পারা ঃ সুরা নং ৩১ লোকমান ঃ রুকু নং ৪ ঃ আয়াত নং ৩১-৩২)।

নিশ্চয়ই জাহাজ সমুদ্রে চলে আল্লাহর অনুগ্রহেই ; তাঁর অনুগ্রহ না হলে কোনভাবেই জাহাজ চলাচল করতে পারত না।

আমরা জেনেছি যে, নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে মানুষ, পশু কিংবা কোন যানবাহন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং জলে নৌকা, জাহাজ কিংবা অন্যান্য জলযান আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে ভাসমান হয়। এ সূত্রগুলোর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক বার বলা হয়েছে।

জাহাজ যে সমুদ্রে চলাচল করে এটাও আল্লাহর এক নিদর্শন। আকাশের নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় করতে পারাটাও আল্লাহর এক নিদর্শন। জ্ঞানী লোকগণ আসমান ও যমীনে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পায়। জাহাজে চড়ে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পারে। জাহাজে চড়ে মাছ ধরে বা ব্যবসাবাণিজ্য করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। জাহাজের সাহায্যে সমুদ্রের বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করতে পারে। যুদ্ধ- জাহাজের মাধ্যমে দেশ জয় ও দেশ রক্ষা করতে পারে। গবেষণা জাহাজের সাহায্যে সমুদ্রে গবেষণা করে সমুদ্রকে মানুষ কাজে লাগাতে পারে। প্রমোদ-তরীর সাহায্যে সমুদ্রে আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

সমুদ্রে জাহাজের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা মাৎস্য সম্পদ আহরণ করতে হলে সমুদ্রের ঝড়তুফান, বজ্রপাত, পর্বতসম তরঙ্গমালা, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি বিপদাপদের ঝুঁকি নিয়ে মাসের পর মাস সমুদ্রে থাকতে হয়। কিন্তু সমুদ্রে সফরের পর যখন প্রচুর লাভবান হয়ে ঘরে ফিরে তখন মানুষ আনন্দিত হয়। কষ্ট সহ্য করে লাভবান হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। বিপদাপদে যে কিভাবে আল্লাহর সাহায্যে উদ্ধার পেয়ে লাভবান হওয়া যায় তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এ সবকিছুর মধ্যে সে আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পায়।

এখানে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে। আকাশে কিছু মেঘমালা সৃষ্টি হয় যেগুলো দেখতে সমুদ্রের তরঙ্গের মত। আবিষ্কারক লর্ড কেলভিন ও হারমেন ভন হেলম্‌হোল্‌জের নামানুসারে এসকল মেঘমালার নাম কেলভিন হেল্‌মহোল্‌জ (Kelvin Helmholtz) বা আকা বিলু (aka billow) বা শেয়ার গ্রেভিটি (shear-gravity) মেঘমালা এবং এগুলো দেখতে আছড়ে পড়া (breaking) সামুদ্রিক তরঙ্গের মত (চিত্র ১১)। সমুদ্রের তরঙ্গমালা যে আকাশের বিশেষ ধরণের মেঘমালার মত হতে পারে তা একটি ঊনবিংশ শতাব্দির আবিষ্কার। কিন্তু কোরআন শরীফে এর কথা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পূর্বেই বলে দিয়েছে। এর দ্বারা কোরআনের অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ যখন এরূপ বিশাল বিশাল তরঙ্গের দ্বারা প্রায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে তখন যাত্রীদের আর জীবনের আশা থাকে না। তখন তারা কেবল আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকে। দেবদেবীর কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু যখনই আল্লাহ তা'লা তাদিগকে স্থলের দিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও সরল পথে চলে কিন্তু কেউ কেউ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দেবদেবীর আরাধনায় লিপ্ত হয়। এরাই মিথ্যাচারী অকৃতজ্ঞ কারণ এরা আল্লাহর নিদর্শণাবলী অস্বীকার করে। এখানে শেষের আয়াতটিতে আকাশের মেঘমালা সদৃশ সমুদ্রের তরঙ্গমালার কথা বলা হয়েছে। আর বিজ্ঞানী কেলভিন ও হেল্‌মহোল্‌জ আকাশের

চিত্র নং ১১। কেলভিন হেল্‌মহোল্‌জ (Kelvin Helmholtz) মেঘমালা

একইভাবে গঠিত মেঘমালা বিশেষকে সমুদ্রের সদৃশ তরঙ্গমালার সাথে তুলনা করেছেন।

(৩৯) ﴿ وَ مَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۚ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾

অর্থ - দুটি সমুদ্র সমান হয় না – একটির পানি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটির পানি লোণা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত (মৎস) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য রত্নাবলী আহরণ কর। তুমি তাতে ওর বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(২২ নং পারা ঃ সুরা নং ৩৫ ফাতির ঃ রুকু নং ২ ঃ আয়াত নং ১২)।

নদীর মোহনা হতে মিঠা পানির স্রোত যখন সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন সমুদ্রের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। সমুদ্রের লোণা পানি হতে নদীর মিঠা পানির ঘনত্ব কম হওয়ায় মিঠা পানি সামুদ্রিক পানির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তখন সমুদ্রের লোণা পানি ও নদীর মিঠা পানি পরস্পর সমান্তরালে প্রবাহিত মনে হয়। এ দুয়ের মাঝে পরিষ্কার একটি অন্তরায় থাকে যার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অনেক দূর প্রবাহিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে মিঠা পানি লোণা পানির সহিত মিশতে থাকে। তখন দুয়ের মাঝের অন্তরায় ধীরে ধীরে বিদূরিত হতে থাকে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের লোণা

পানি নদীর মিঠা পানির ভিতর প্রবেশ করে। সমুদ্রের পানি ভারি হওয়ার কারণে উহা নদীর পানির নীচ দিয়ে ওজানের দিকে প্রবাহিত হয়। যেখানে নদী কিংবা সমুদ্র অশান্ত থাকে সেখানে লোণা পানি ও মিঠা পানি তাড়াতাড়ি মিশে যায়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী মিঠা পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। এখন বহু দেশে লবণ পানির লবণ দূর করে উহাকেও মিঠা পানিতে পরিণত করে পান করছে। বিদূরিত লবণকে বিশুদ্ধ করে খাদ্যলবণ হিসাবে ব্যবহার করছে। মিঠা পানিতে যেসকল প্রাণী বাস করে সেগুলো লোণা পানিতে বাঁচতে পারে না। মিঠা পানির ঘনত্ব মাছের আভ্যন্তরিন তরল পদার্থের (যথা রক্ত, সাইটোপ্লাজম ইত্যাদির) ঘনত্ব হতে কম। ফলে অভিস্রাবণ (Osmosis)এর নিয়মানুসারে [দুটি বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ (Solution) কোন অর্ধভেদ্য পর্দার (Semipermeable membrane) দ্বারা পৃথককৃত হলে অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের দ্রবণ হতে দ্রাবক অণু (Solvent molecules) অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে অধিকতর ঘন দ্রবণে প্রবেশ করতে থাকে যে পর্যন্ত না দুটি দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়ে যায়। একে অভিস্রাবণ পদ্ধতি বলে। যেমন- কোন পাত্রে ৪০% ও ২০% দুটি চিনির দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দার দ্বারা পৃথককৃত হলে ২০% চিনির দ্রবণ হতে পানি ক্রমাগতভাবে অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে ৪০% চিনির দ্রবণে প্রবেশ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না উভয় দ্রবণের ঘনত্ব ৩০% হবে)] মিঠা পানির মাছের কিংবা অন্যান্য মিঠা পানির প্রাণীর শরীরের নির্দ্দিষ্ট অংশের অর্ধভেদ্য পর্দা (Semipermeable)) ভেদ করে পানি ক্রমাগতভাবে শরীরে প্রবেশ করতে থাকে এবং মিঠা পানির প্রাণীর বৃক্কে (Kidney) গ্লুমারিউলাসের (Glumerulus) সংখ্যা বেশী থাকাতে বিরেচন প্রক্রিয়ার (Excretion) মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি দেহ হতে বেরিয়ে যায়। এর ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া চলে লোণা পানির প্রাণীর দেহে। বাইরের লোণা পানির ঘনত্ব সেখানকার মাছের কিংবা অন্যান্য প্রাণীর শরীরের আভ্যন্তরিন তরল পদার্থের ঘনত্ব হতে বেশী হওয়ায় শরীরের অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে শরীরের আভ্যন্তরিন তরল পদার্থ বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকে। তাই শরীরের পানির পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য লোণা পানির প্রাণীগুলো ক্রমাগতভাবে পানি পান করতে থাকে। যেসকল মাছ মিঠা পানি হতে সাগরের লোণা পানিতে অভিপ্রয়ান (Migration) করে তারাও শরীরে পানির ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্রমাগতভাবে পানি পান করতে থাকে এবং এসময় এরা এদের লবণগ্রন্থির (Saltgland) সাহায্যে অতিরিক্ত লবণ বের করে দিতে পারে। আবার যখন কোন মাছ সাগরের লোণা পানি হতে নদীর মিঠা পানির দিকে অভিপ্রয়ান করে তখন তার বৃক্কের অনেক গ্লুমারিউলাস যেগুলো লোণা পানিতে নিষ্ক্রিয় ছিল সেগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে, ফলে বিরেচন বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যায়। এভাবে জলজ প্রাণী তাদের দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে এবং বেঁচে থাকে। আমাদের দেশে বর্ষাকালে অনেক মিঠা পানির মাছ নদীর মোহনায় পাওয়া যায় কারণ তখন মোহনার উপরিভাগের পানি প্রায় মিঠা থাকে। আবার শীতকালে অনেক লোণা পানির মাছ মোহনার নীচের স্তরের পানিতে চলে আসে, কারণ মোহনার নীচের স্তরে তখন লোনা পানি ঢুকে।

উপরিউক্ত কারণে আমরা সকল পানিতে হাজার হাজার প্রজাতির তাজা মাছ পাই। মাছ ছাড়াও মিঠা পানিতে চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক. বেঙ, কচ্চপ, অন্যান্য সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী , শুশুক (Porpoise) ইত্যাদি পাওয়া যায়। সমুদ্রের লোণা পানিতে অমেরুদন্ডীয় প্রাণীর মধ্যে মোলাস্কাজাতীয় প্রাণী প্রাণী [যেমন - ক্লেমস (Clams),সি স্নেইলস (Sea snails) এবং স্কুইড্স (Squids) ইত্যাদি], ইকাইনোডার্মেটাজাতীয় (Echinodermata) [যেমন - সি কিউকাম্বার (Sea cucumber), সি আরসিন (Sea urchin) ইত্যাদি] এবং ক্রাস্টাসিয়াজাতীয় (Crustacea) প্রাণী [যেমন- বিভিন্নধরণের চিংড়ি (Prawns and Shrimps), লব্স্টার (Lobsters), কাঁকড়া(Crabs) ইত্যাদি] পাওয়া যায়। মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে। এগুলো মানুষের খাদ্যরূপে আহরিত হয়। এছাড়া সমুদ্রের মধ্যে ঝিনুকজাতীয় (Bivalvia)অমেরুদন্ডীয় প্রাণীতে বিভিন্ন ধরণের মণিমুক্তা উৎপন্ন হয় যেগুলো মানুষ যুগ যুগ ধরে সংগ্রহ করে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। মিঠা পানির ঝিনুকজাতীয় (Bivalvia) মোলাস্কাতেও মণিমুক্তা পাওয়া যায়। এগুলোও অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সমুদ্রে জলযানসমূহ (কিংবা যেকোন বস্তু) ভেসে থাকে আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী এবং এরা চলে নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। জলযান ব্যবহার করে মানুষ পৃথিবীর জলভাগে মৎস্য ও মাৎস্য (Fisheries) প্রাণী এবং উদ্ভিদ (শৈবাল) আহরণ করত খাদ্য ও জীবিকার জন্য। সাজসজ্জার জন্য মণিমুক্তা আহরণ করত, এখনও তাই করে। জীবিকার জন্য নদী সাগর পারি দিয়ে দেশবিদেশে যেত, এখনও যায়। সমুদ্রের পানি শুকিয়ে লবণ তৈরী করা হয় । সমুদ্রের তলায় বিভিন্ন ধরণের খনিজপদার্থ যেমন খনিজ তৈল, গ্যাস ইত্যাদি রয়েছে। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকার আহরণযোগ্য খনিজ পদার্থ রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ ও স্রোত এবং সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহ হতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের পানি হতে লবণ সরিয়ে সুপেয় মিঠাপানি উৎপাদন করা হয়। উপরে উল্লিখিত নেয়ামতগুলি দান করে আল্লাহতা'লা মানুষকে ব্যাপকভাবে অনুগ্রহ করেছেন যাতে করে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

(٤٠) ﴿ وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴾

অর্থ - তাঁর অন্যতম নিদর্শণ হল সমুদ্রে (ভাসমান) পর্বতসম জাহাজসমূহ ।

(٤١) ﴿ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴾

অর্থ- তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। তখন সেগুলো (জাহাজসমূহ) এর পৃষ্ঠে (সমুদ্রপৃষ্ঠে) নিশ্চল হয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক সবরকারী কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শণাবলী রয়েছে ।

(٤٢) ﴿ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾

অর্থ - অথবা তাদের (মানুষের) (মন্দ) কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন।

(২৫ নং পারা ঃ সুরা নং ৪২ শূরা ঃ রুকু নং ৪ ঃ আয়াত নং ৩২-৩৪)।

বিশাল বিশাল জাহাজ সমুদ্রে ভাসে, এগুলোকে আল্লাহই ভাসিয়ে রাখেন। নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর নিদর্শণ। জলযানসমূহ চলেও আল্লাহর হুকুমেই। আমরা আগেই জেনেছি যে, সমুদ্রে জলযান (কিংবা যেকোন বস্তু) ভেসে থাকে আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী এবং এরা চলে নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আল্লাহর হুকুম না হলে এসকল সূত্র কার্যকরী হতে পারত না।

যে আল্লাহ হাওয়া চালনা করেন সে আল্লাহ ইচ্ছা করলেই হাওয়া থামিয়ে দিতে পারেন, তখন পালে আর হাওয়া লাগবে না, জাহাজও চলবে না, স্থির হয়ে থাকবে। আধুনিক জাহাজের ইঞ্জিনের পিষ্টনটি তেল বা গ্যাসের চাপে পিছনে না গেলে অথবা নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি কাজ না করলে আধুনিক জাহাজও চলবে না। এ সূত্রও আল্লাহর হুকুমের নিয়ন্ত্রণাধীন, তবে আল্লাহর নিয়ম-কানুন বিশেষ বিশেষ অলৌকিক ক্ষেত্র ব্যতীত ক্বিয়ামত শুরু না পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। যদিও আমাদের নবী (সাঃ) আল্লাহর হুকুমে মানুষকে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা (মোজেজা) দেখিয়েছেন তবু মানুষকে স্বাভাবিক জীবন যাপনেরই পথ প্রদর্শন করে গেছেন। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষ আল্লাহর কিছু পরীক্ষার সম্মুীন হয়, কারণ আল্লাহ নিজেই চান তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করে ধীরে ধীরে তাঁর নৈকট্য প্রদান করতে। পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। সবরকারী ব্যক্তি সাধারণতঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ও কৃতজ্ঞ হয়। সবরকারী কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পানির উপর জাহাজের ভাসার মধ্যে ও এর চলাচলের মধ্যে, বাতাসকে থামিয়ে জাহাজকে নিশ্চল করার মধ্যে আল্লাহর নিদর্শণ দেখতে পায়।

মানুষের মন্দ কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় ঘটে এবং সাগরে জাহাজ ডুবি হয়, বায়ু প্রবাহে নিশ্চলতা সৃষ্টি হয়, জাহাজও তখন সমুদ্রবক্ষে স্থির হয়ে

পড়ে। একটি জাহাজ যখন বিশাল সমুদ্রে অচল হয়ে পড়ে তখন যাত্রীদের কি অসহায় অবস্থা হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না । তখন খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, যাত্রীরা ধুকে ধুকে মরতে থাকে, খাদ্যাভাবে মানুষকে মানুষ খায় যদিও আধুনিক জাহাজে সাধারণতঃ এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি কম সৃষ্টি হয় । এভাবে মানুষকে আল্লাহ শায়েস্তা করে থাকেন। তবে তিনি অশেষ ক্ষমাকারী, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন।

(٤٣) ﴿ فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴾

অর্থ - তা হলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রি বেলায় বেরিয়ে পড়। নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

(٤٤) ﴿ وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴾

অর্থ - এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয়ই ওরা নিমজ্জিত বাহিনী।

(২৫ নং পারা ঃ সুরা নং ৪৪ দোখান ঃ রুকু নং ১ ঃ আয়াত নং ২৩-২৪)।

মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায় যখন তাকে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছিল তখন নিরাপত্তার খাতিরে আল্লাহ তা'লা মুসা (আঃ)কে তার ও তার দলের লোকদেরকে নিয়ে রাত্রি বেলায় বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সাবধানতার জন্য এও বলে দিচ্ছেন যে ফিরাউন তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। মুসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফিরআউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ তা'লা তাকে বলে দিলেন যে, 'তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না - যাতে ফিরআউন শুষ্ক ও তৈরী পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দিব এবং তারা নিমজ্জিত হবে।' (ইবনে- কাছীর)।

সমুদ্রের মধ্য দিয়ে কিভাবে রাস্তা তৈরী হয়েছিল তা ইতিপূর্বে সুরা শু'আরায় বর্ণনা করা হয়েছে। মুসা (আঃ) সমুদ্র পারি দেওয়ার ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত ছিলেন না, কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা তাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন। নবীগণ আল্লাহ তা'লার হুকুম পালন করতে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না কারণ আল্লাহ তাদেরকে ঐ ব্যাপারে আগেই খবর দিয়ে রাখতেন অথবা তাদের আল্লাহর উপর এমন বিশ্বাস ও ভরসা থাকত যে, হুকুম পালনে কোন দ্বিধাই তাদের উপর কাজ করত না।

(٤٥) ﴿ اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾

অর্থ – তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর আদেশক্রমে এর মধ্যে জাহাজ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পার।

(২৫ নং পারা ঃ সুরা নং ৪৫ জাছিয়াহ্ ঃ রুকু নং ২ঃ আয়াত নং ১২)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'লা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছেন যে, তিনি সমুদ্রকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। সমুদ্র স্থলভূমির মতই মানুষের জন্য এক বিশাল সম্পদ। ভূপৃষ্ঠের ৭০% জায়গা সমুদ্র যার আয়তন প্রায় ৩৬০ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে মানুষ সমুদ্র হতে মৎস ও মাৎস্যসম্পদ আহরণ করত নিজে খাওয়ার জন্য ও জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যও সমুদ্র ব্যবহার করত। সমুদ্রের পানি

শুকিয়ে লবণ তৈরী করত। আধিপত্য বিস্তারের জন্য সমুদ্র পথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত। সমুদ্রপথে প্রাচী ন গ্রীক, পারসীয়, রোমান এবং আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে এবং বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। মধ্য যুগে পারসীয়, রোমান, রোমান খ্রীষ্টান এবং আরব মুসলিমরা আধিপত্য বিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের জন্য সমুদ্র পথে যুদ্ধবিগ্রহ করেছে ও বিভিন্ন দেশে পারি জমিয়েছে। আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, আধিপত্য বিস্তার এবং মাৎস্য ও খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য সমুদ্র ব্যবহার করছে। তা ছাড়া এখন সমুদ্রের লবণ পানি হতে মিঠা পানি তৈরী করছে, সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহ হতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে এবং অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্র-স্রোত হতে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারবে। এমন এক দিন আসবে যেদিন মানুষ সমুদ্রের পানি হতে ফসল উৎপন্ন করবে। এখনও সমুদ্রে মৎস, বিভিন্ন প্রাণী ও শৈবাল চাষ হচ্ছে। সমুদ্র পাড়ে মৎস ও মৎস্য জাতীয় প্রাণী (যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, কচ্চপ ইত্যাদি) ও শৈবালের চাষ হচ্ছে সমুদ্রের পানি ব্যবহার করে। সমুদ্রের কাছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরী ও ইন্ডাস্ট্রি স্থাপিত হচ্ছে সহজে সমুদ্র পথে আমদানী -রফতানী করার জন্য এবং সমুদ্রে বর্জ্য নিঃসরণের সুবিধার জন্য।

সমুদ্রকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়ার পর বলা হচ্ছে যে, তাঁর (আল্লাহর) আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে। আল্লাহ আদেশ না করলে সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করত না, কারণ তাঁরই আদেশে জাহাজ সমুদ্রে ভাসে (অর্থাৎ আর্কিমিডিসের সূত্র কাজ করে), বায়ু প্রবাহ হয়,পালে হাওয়া লাগে এবং তাঁরই আদেশে আধুনিক জাহাজের পিষ্টন কাজ করে (অর্থাৎ নিউটনের তৃতীয় সূত্র কাজ করে)। সমুদ্রকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন কিন্তু মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যাবলী অর্থাৎ মানুষ নিজেই আল্লাহর নিয়ন্ত্রাণাধীন। নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করে লাভবান হতে উপদেশ দিচ্ছেন (অর্থাৎ পারাপার করে, জীবিকা নির্বাহ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, সামুদ্রিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ করে, দেশ আবিস্কার ও জয় করে নতুন নতুন বসতি স্থাপন করে এবং আল্লাহর ধর্ম প্রচার করে যেন মানুষ উপকৃত হয়)। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে যেন মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কারণ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার প্রতি তিনি তাঁর অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ হলে তার কাছ থেকে তাঁর দান চিনিয়ে নেন।

(٤٦) ﴿فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ وَ هُوَ مُلِیْمٌ﴾

অর্থ -অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত।

(২৭নং পারা ঃ সুরা নং ৫১ যারিয়াত ঃ রুকু নং ২ ঃ আয়াত নং ৪০)।

এখানে আল্লাহ তা'লা বলছেন যে, তিনি ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনীকে ধরে সমুদ্রে (লোহিত সাগরে) নিক্ষেপ করলেন। ফিরআউন নিজের ক্ষমতা ও তার সেনাবাহিনীর শক্তির জন্য অহংকার করত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সে তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে মুসা (আঃ) ও তার সঙ্গীগণের পশ্চদ্ধাবন করে। মুসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে শুষ্ক পথ তৈরী হয়ে যায় এবং তিনি তার সঙ্গীগণকে নিয়ে ঐসকল পথে সমুদ্রের অপর পাড়ে চলে যান । ফিরআউন যখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঐসকল শুষ্ক পথে মুসা (আঃ)এর পশ্চাদ্ধাবন করছিল তখন সমুদ্রের পানি একত্র হয়ে যায় এবং সে তার সৈন্যবাহিনী সহ সমুদ্রের পানিতে ডুবে মরে। সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে ঐসকল শুষ্ক পথ কিভাবে তৈরী হয়েছিল তার কোন সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়, কারণ ভাঁটার সময় পানি কমে রাস্তা তৈরী হলে মুসা (আঃ)এর লাঠির আঘাতের প্রয়োজন ছিল না। কোন শক্তিশালী রাগান্বিত ব্যক্তিই কেবল কোন দুর্বল তুচ্ছ ব্যক্তিকে ছুড়ে মারতে পারে। প্রবল শক্তিধর মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর কাছে ফিরআউন ও তার বাহিনী তুচ্ছ বস্তু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাই এখানে হয়ত তাদেরকে ছুড়ে মারার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফিরআউনের বাহিনীর ধ্বংসের জন্য প্রধানতঃ সেই দায়ী, কারণ সেই তাদিগকে বিপথগামী করেছিল। আল্লাহ তাকে বার বার সুযোগ দেয়ার পরও সে নিজেকে সংশোধন করে নাই। তাই আল্লার বিচারই সঠিক ছিল।

(٤٧) ﴿ وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴾

অর্থ – এবং কসম উত্তাল (পানিতে পরিপূর্ণ) সমুদ্রের ।

(২৭নং পারা ঃ সুরা নং ৫২ তূর ঃ রুকু নং ১ ঃ আয়াত নং ৬)।

مَسْجُوْرْ এর অর্থ উত্তাল (সমুদ্র), পরিপূর্ণ, উত্তপ্ত, স্ফীত, ইত্যাদি।

এখানে আল্লাহ তা'লা উত্তাল (স্ফীত) সমুদ্রের কসম করে মুহাম্মদ (সাঃ)কে বলছেন যে, (ক্বিয়ামতের দিন) "নিশ্চয়ই, আপনার প্রতিপালকের শাস্তি অতি বাস্তব।"

কোরআনে আল্লাহ বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন, এমন কি তাঁর নিজের শপথ করেছেন কোন ঘটনা ঘটার অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করার জন্য। উপরিউক্ত আয়াতে উত্তাল সমুদ্রের শপথ করেছেন ক্বিয়ামতের শাস্তির বাস্তবতা প্রমাণের জন্য। কেন এখানে উত্তাল সমুদ্রকে শপথের জন্য বেছে নিয়েছেন তিনিই ভাল জানেন। সমুদ্রের উত্তালতা বা স্ফীতি (Swell) বলতে বায়ুপ্রবাহের ফলে উৎপন্ন ঐসকল তরঙ্গমালাকে বোঝায় যেগুলি তাদের উৎসস্থল (সমুদ্রবক্ষের কোন অংশ) হতে ক্রমে দূরে সরে যায়। উৎসস্থলে বায়ু প্রবাহ অধিকতর শক্তিশালী হলে স্ফীতিও বৃহত্তর হয় এবং তরঙ্গমালা অধিকতর দূরে প্রবাহিত হয়। উৎসস্থলে বায়ু প্রবাহ দীর্ঘায়িত হলে উত্তালতাও দীর্ঘস্থায়ী হয় এমন কি বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিংবা গতি পরিবর্তন করার পরও। দুনিয়াতে (উৎসস্থলে) মানুষ কোন পাপ করলে বা পাপের রীতি চালু করলে পরকালে তার শাস্তি হবে। পাপ যত বেশী করবে তার শাস্তিও তত বেশী হবে, দীর্ঘ দিন ধরে করলে শাস্তিও দীর্ঘায়িত হবে। মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে কোন ব্যক্তির পাপ বন্ধ হয়ে গেলেও অনুসারীদের মাধ্যমে সেই পাপের রীতি চলতে থাকে কিংবা সেই পাপ কোন ভিন্ন রূপ নিয়ে চলতে থাকে। ফলে পাপী তার মৃত্যুর পরে যদিও আর কোন পাপ করতে পারে না তবু তার অনুসারীদের কারণে তার শাস্তি চলতে থাকবে। সমুদ্রের উত্তালতার সঙ্গে পাপের সাদৃশ্যের কারণে হয়ত আল্লাহ তা'লা এখানে উত্তাল সমুদ্রের শপথ করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

(٤٨) ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴾

অর্থ - তিনি পাশাপাশি দুটি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন।

(٤٩) ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخ " لَّا يَبْغِيٰنِ ﴾

অর্থ - তাদের উভয়ের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না।

(٥٠) ﴿فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴾

অর্থ - অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে ?

(٥١) ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ ﴾

অর্থ – উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল ।

(৫২) ﴿فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴾

অর্থ - অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে?

(৫৩) ﴿وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِی الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ﴾

অর্থ - সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতসদৃশ জাহাজসমুহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

(২৭নং পারা ঃ সুরা নং ৫৫ রহমান ঃ রুকু নং ১ ঃ আয়াত নং ১৯-২৪)।

পূর্বেই উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, ভূমধ্যসাগরের পানি আটলান্টিক মহাসাগরের পানি হতে তুলনামূলকভাবে উষ্ণ, লবণাক্ত ও কম ঘন। ভূমধ্যসাগরের পানি যখন জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে তখন এটা প্রায় ১০০০ মিটার গভীরতায় তার নিজস্ব উষ্ণ, লবণাক্ত ও কম ঘন বৈশিষ্ট্যের পানি নিয়ে আটলান্টিকের মধ্যে কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় পানি এ গভীরতায় স্থিরতা ও স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু মহাসাগরীয় পিকনোক্লাইন (Pycnocline)) নামক এক অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার কারণে আটলান্টিকের পানির সাথে মিশে যায় না। উপরের ২০ নং আয়াতে দু সমুদ্রের মাঝে এ প্রতিবন্ধকতার কথাই বলা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে "অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে ?" মানুষ নিজেই আল্লাহর একটি অবদান। কারণ আল্লাহ তা'লা মানুষ ছাড়াও অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তাদের কাউকে বিচার-বিবেক দেন নি। বিজ্ঞানের মতে একমাত্র মানুষই জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন (Rational) প্রাণী, সেই কেবল অযথার্থ (Wrong) ও যথার্থের (Right) মধ্যে প্রভেদ করতে (Distinguish) পারে। এরূপে মানুষকে আল্লাহ তা'লা জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সমস্ত বিশ্বজগৎ তারই প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন, তাকেই দান করেছেন সব কিছুর উপরে শ্রেষ্ঠতা (Mastery)। উদ্ভিদ, প্রাণী , মাটি, বাতাস,পানি,আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র সবই তার অধীন করে দিয়েছেন যেন সে এগুলো তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ব্যবহার করে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে। যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়ে এগুলোর সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। একদিন সব কিছু লয় হয়ে যাবে, কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে, তাকে প্রদত্ত অসংখ্য অবদান সম্বন্ধে সে জিজ্ঞাসিত হবে। তার অবদানের ন্যায্য কিংবা অন্যায্য ব্যবহার সে অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ তার সকল কর্ম-কান্ড ধারণ (Recorded) করা থাকবে এবং তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হলে সঠিক উত্তর দিতে না পারলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, আর সঠিক উত্তর দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে।

উপরে ১৯ ও ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাশাপাশি প্রবাহিত দুটি সমুদ্র যাদের একটির পানি অপরটির পানি হতে একটি অন্তরালের মাধ্যমে পৃথক থাকে এবং ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের উভয়ের মাঝে মোতি ও প্রবাল উৎপন্ন হয়।

মোতি বা মুক্তা (Pearl) একপ্রকার কঠিন বস্তু যা সাধারণতঃ অইস্টার (Oyster) নামক ঝিনুক (Bivalve) জাতীয় মোলাস্কার (Mollusc) ঠিক খোলার (Shell) নীচে অবস্থিত কোমল পেশী মেন্টেলের (Mantle) ভিতর উৎপন্ন হয়। এগুলোকে মোতি ঝিনুক (Pearl oyster) বলা হয়। মোতি ঝিনুকের কঠিন খোলার মত কেলসিয়াম কার্বোনেটে(Calcium carbonate)এর তৈরী একপ্রকার রত্নপাথর যা শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে সৌন্দর্যের বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসকল মোতি অইস্টার (*Pinctada* sp.) প্রধানতঃ শ্রীলঙ্কা, ভেনিজুয়েলা, পারস্য উপসাগর, জাপান,

অস্ট্রেলিয়া, ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মত উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে উৎপন্ন। ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর যেখানে পাশাপাশি প্রবাহিত হয় সেখানেও মোতি উঃপন্ন হয়।

অধিকাংশ প্রবাল শৈলমালা (Coral reefs) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীর গুচ্ছসমূহ (Colonies) দ্বারা গঠিত হয় । এরা যে সামুদ্রিক পানিতে উৎপন্ন হয় তাতে সামান্য পরিমাণ পুষ্টিকারক দ্রব্য বিদ্যমান থাকে । কঠিন প্রবালসমূহ পলিপ (Polyp) বা এক একটি জীব দেহ দ্বারা রচিত হয় এবং এসকল পলিপ দলে দলে গুচ্ছবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রবালসমূহ কঠিন বহিঃকঙ্কাল (Exoskeletons) নিঃসৃত করে যেগুলো প্রবাল পলিপকে (জীবদেহকে) ধারণ ও রক্ষা করে। সাধারণতঃ প্রবাল শৈলমালা উষ্ণ, অগভীর, স্বচ্ছ, রৌদ্রময় ও আন্দোলিত লোণা পানিতে সব চাইতে ভাল উৎপন্ন হয়। কোন কোন সমুদ্র যেমন আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্য সাগরের গভীর ও ঠান্ডা পানিতেও কিছু কিছু প্রবাল উৎপন্ন হয়। মূল্যবান প্রবাল দ্বারা লাল প্রবাল (*Corallium rubrum*) ও এর কিছু জ্ঞাতি প্রজাতিকে বুঝায় । মূল্যবান প্রবালের বৈশিষ্ট হল এদের গাঢ় লাল বা পাটল-কমলা রংএর কঙ্কাল যা অলঙ্কার তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট লাল প্রবাল ভূমধ্য সাগরে উৎপন্ন হয়। জিব্রালটার প্রণালীর নিকটবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরেও এরা পরিদৃষ্ট হয়। এক হিসেব মতে সারা বিশ্বের প্রবাল শৈলমালা হতে বার্ষিক ৩৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়। ২৩

এখানে সবচাইতে আর্শ্চয্যজনক বিষয় হল, জিব্রাল্টার প্রণালীর নিকট যেখানে ভূমধ্য সাগরের পানি ও আটলান্টিক মহাসাগরের পানি পাশাপাশি প্রবাহিত হয় অথচ পরস্পর মিশে যায় না এরূপ পাশাপাশি প্রবাহিত অথচ অন্তরালের মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন যে কোন দুটি সমুদ্রের উভয়টিতে যে মোতি উৎপন্ন হতে পারে তা কোরআনে ১৪৩৯ বছর পূর্বেই বলে দেয়া হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (২৩ নং আয়াতে) আল্লাহ তা'লা আবার জিজ্ঞেস করছেন " অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে ?" এরূপে সুরা আররহমানে যখনই কোন বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তখনই আল্লাহ জ্বিন ও মানুষকে সতর্ক ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্যে পুনঃ পুনঃ (৩১ বার) একই প্রশ্ন করেছেন। এখানেও পাশাপাশি প্রবাহিত অথচ অন্তরালের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন দুটি সমুদ্রের উভয়টির পানিতে যে মোতি ও প্রবাল পাওয়া যায় এ অবদানের কথা উল্লেখ করে একই প্রশ্নের মাধ্যমে মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সতর্ক ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করেছেন।

এর পরের আয়াতে (২৪ নং আয়াতে) আল্লাহ তা'লা সমুদ্রে বিচরণশীল বিশাল বিশাল জাহাজসমূহকে পর্বতের সাথে তুলনা করেছেন। এগুলো এত উঁচু যে, সমুদ্রবক্ষে এদেরকে পর্বতের মতই মনে হয়। পানিতে এদের বোঝাসহ ভাসমানতা, চলাচল, চলাচলের দিক ইত্যাদি সবই আল্লাহর বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন। আগেই বলা হয়েছে যে, আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে এরা সমুদ্রবক্ষে ভাসে এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে এরা নির্দ্দিষ্ট দিকে চলাচল করে। এ সূত্রদ্বয় আল্লাহরই বিধান। সামুদ্রিক ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প ইত্যাদিও আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনি ইচ্ছা করলে এসকল বিপর্যয়ের মাধ্যমে কিংবা ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করে বা চালকের মতিভ্রম করে অথবা অন্য যেকোনভাবে জাহাজসূহকে দিকহারা করে দিতে পারেন, এমনকি ধ্বংস করে দিতে পারেন। সমুদ্রবক্ষে জাহাজে জাহাজে কিংবা পানিতে নিমজ্জিত বা ভাসমান অন্য কোন কঠিন বস্তুর সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে এগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আবার আর্কিমিডিসের সূত্র অকার্যকর করে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারেন অথবা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অকার্যকর করে জাহাজকে সমুদ্রবক্ষে অচল করে দিতে পারেন। এসবই তাঁর ইচ্ছা ও নিরতিশয় ক্ষমতার অধীন।

(٥٤) ﴿وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾

অর্থ – যখন সমুদ্রসমূহকে উত্তপ্ত (উত্তাল) করে তোলা হবে।

(৩০নং পারা ঃ সুরা নং ৮১ তাক্‌ভীর ঃ রুকু নং ১ ঃ আয়াত নং ৬)।

سَجَّرَ (تَسْجِيْر) এর অর্থ উত্তপ্ত করা, উত্তাল করা, (উপর দিয়ে) প্রবাহিত করা, খালি করা ইত্যাদি।

গ্রীন হাউজ (Green house) গ্যাসসমূহের কারণে পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে, সমুদ্রের পানিও উত্তপ্ত হচ্ছে ও বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে। ধীরে ধীরে সমুদ্রের পানি নিম্নভূমিকে তলিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবতঃ এখানে সমুদ্রের পানির এরূপ ধীর উত্তাপ বৃদ্ধির কথা বলা হয়নি বরং এখানে উত্তপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে যার কারণে সমুদ্রে আর কোন পানি থাকবে না, পানি বাষ্পিভূত হয়ে যাবে। এ আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে (ক্বেয়ামত শুরু হওয়ার সময়) সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে, নক্ষত্রসমূহ মলিন হয়ে যাবে, পর্বতমালা অপসারিত হবে, (আরবদের নিকট অতি প্রিয়) দশ মাসের গর্ভবর্তী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, ভয়ে বন্য শিকারী ও শিকার পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে ।

৩.৫ বিলিয়ন বছরের মধ্যে সূর্যটি ঠিক এখন যে অবস্থায় আছে তার চাইতে ৪০% উজ্জ্বতর হবে, তখন এটা মহাসমুদ্রসমূহকে উত্তপ্ত করে তুলবে, বরফখন্ডগুলোকে স্থায়ীভাবে গলিয়ে দিবে এবং সে সময় বায়ুমন্ডলের সমস্ত জলীয়বাষ্প মহাশূণ্যে হারিয়ে যাবে।২৪ এ অবস্থায় কোন জীব ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে বেঁচে থাকতে পারবে না। পৃথিবী নামক গ্রহটি তখন ঠিক শুক্র গ্রহের ন্যায় আরেকটি উত্তপ্ত ও শুষ্ক বিশ্বে পুরাপুরিভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ২০০৮ সালে জোতির্বিজ্ঞানী ক্লস পিটার শ্রোডার (Klaus-Peter Schroder) এবং রবার্ট কেনন স্মিত (Robert Cannon Smith) মোটামুটি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে সূর্য এত বৃহৎ হবে যে এর সর্ববহিঃস্থ পৃষ্ঠ-স্তর (Outermost surface layer) ১০৮ মিলিয়ন মাইল (প্রায় ১৭০ মিলিয়ন কিলোমিটার) পর্যন্ত প্রসারিত হবে এবং বুধ (Mercury), শুক্র (Venus) ও পৃথিবীকে গ্রাস করবে।২৫ যে কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যটি একটি লোহিত দৈত্যে (Red giant) (চিত্র ১১) রূপান্তরিত হবে তা পূর্ণাঙ্গ হতে প্রায় ৫.৪ বিলিয়ন বছর লাগবে। এভাবে সূর্যটি যখন একটি লোহিত দৈত্যে পরিণত হতে প্রস্তুত হবে তখন পৃথিবীটি সেঁকতে (Baking) থাকবে এবং একটি গ্রহের বাষ্পাগারে (Steam-bath) পরিণত হবে এবং এর মহাসমুদ্রসমূহের পানি তখন বাষ্পীভূত হয়ে ভেঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হবে।

সূর্যটি যখন লোহিত দৈত্যে পরিণত হয়ে যাবে তখন এর ব্যাস ১০০ মিলিয়ন থেকে ১ বিলিয়ন কিলোমিটার (৬২ হতে ৬২১ মিলিয়ন মাইল) পর্যন্ত প্রসারিত হবে এবং তখন সেটা বর্তমান সূর্যের আকারের চাইতে ১০০ হতে ১০০০ গুণ বড় হবে। তখন যেহেতু এর তেজ (Energy) অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিসর জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে, এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাত্র ২২০০ থেকে ৩২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (৪০০০ হতে ৫৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে) নেমে আসবে, যা বর্তমান সূর্যের তাপমাত্রার অর্ধেকের চাইতে সামান্য বেশী। তাপমাত্রার এ পরিবর্তন একে আলোকের বিশ্লিষ্ট বর্ণের (Spectrumএর) লোহিত অংশে প্রদীপ্ত করবে। তখন এটা লোহিত দৈত্য নামে পরিচিতি লাভ করবে যদিও এর চেহারা প্রায়ঃশই কমলা রং ধারণ করবে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিস্প্রভ বা মলিন হয়ে যাবে। একইভাবে অন্যান্য নক্ষত্রসমূহও মলিন হয়ে যাবে।

৫৩ পৃষ্ঠার চিত্র নং ১২ । লোহিত দৈত্য (Red Giant)

(৩০) ﴿ وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾

অর্থ - যখন সমুদ্রসমূহকে সবলে ফাটিয়ে নির্গত করা হবে।

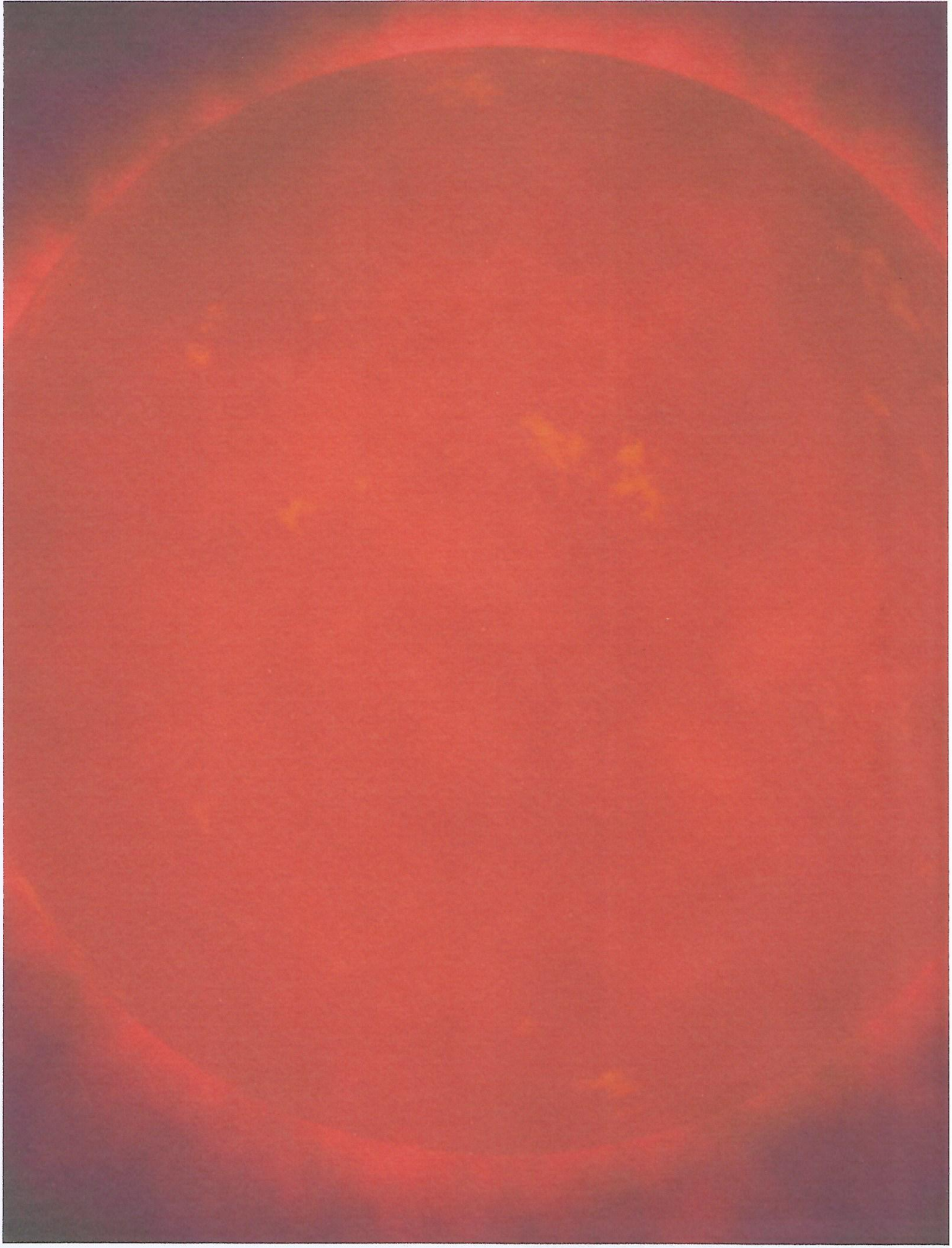

(৩০নং পারা ঃ সুরা নং ৮২ ইন্‌ফিত্বার ঃ রুকু নং ১ ঃ আয়াত নং ৩)।

فَجَّرَ (تَفْجِيْرَ) এর অর্থ ফাটানো, ফাটিয়ে বের করা, বিস্ফোরিত করা, বেগে প্রবাহিত করা ইত্যাদি। সমুদ্রসমূহকে কিভাবে সবলে ফাটিয়ে নির্গত করা হবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। এখানে সমুদ্রসমূহকে দ্বারা সমুদ্রের পানিকেই বোঝানো হয়েছে। একটি সমুদ্রকে যদি একটি পানি ভরা থালা মনে করা হয় এবং ঐ থালার তলাকে হাতে ধরে নাড়ানো হয় তবে থালার পানি থালার পাড় উপচিয়ে বাইরে বেড়িয়ে আসে । একইভাবে সমুদ্রের তলার কোন অংশে যখন ভূমিকম্প হয় তখন এর তলা আন্দোলিত হয়, এবং এর পানি সমুদ্র সংলগ্ন স্থলভাগের দিকে উপচিয়ে আসে। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে হয়ত সমুদ্রের তলায় প্রচন্ড ভূমিকম্প বা কোন বিস্ফোরণ হবে এবং এর কারণে সমুদ্রের পানি স্থলভাগের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা ক্বিয়ামতের সময় প্রচন্ড ভূমিকম্প হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা ক্বিয়ামত শুরু হওয়ার সময় যদি গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে যায় এবং সূর্যের কিরণ বেড়ে গিয়ে পৃথিবী অত্যাধিক উত্তপ্ত হয় (যা পূর্বে বলা হয়েছে) তখন বরফ গলে সমুদ্রে পানির পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং এর আয়তনও বেড়ে যাবে এবং উত্তপ্ত পানি সমুদ্র সংলগ্ন স্থলভাগের দিকে ধাবিয়ে আসবে ও মিঠা পানির সাথে একাকার হয়ে যাবে। পরিশেষে ক্বিয়ামতের সময় সকল পানি উত্তপ্ত ও বাষ্পীভূত হয়ে মহাশূণ্যে উড়ে যাবে যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যার দয়ায় গ্রন্থটি লিখা সম্ভব হয়েছে। শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিনিসপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করায় এবং ইংরেজী হতে বাংলায় অনুবাদে সাহায্য করায় গ্রন্থকার তদীয় তৃতীয় পুত্র মোঃ ফাত্তাহ বিন কাদের এম. এ. (ইংলিশ), প্রিন্সিপাল অফিসার, এক্সিম ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ এর নিকট কৃতজ্ঞ। কম্পিউটারের কাজে তদীয় প্রথম পুত্র মোঃ তালহা বিন কাদের এম. এস. সি., এম. বি. এ., ডিপুটি ম্যানেজার, ইয়ংওয়ান কর্পোরেশন লিঃ বাংলাদেশ, সবসময় সর্বপ্রকারে সাহায্য-সহযোগীতা করার জন্য গ্রন্থকার তার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার গঠনমূলক সমালোচনা ও শুদ্ধ করে লিখার কাজে সহায়তা করার জন্য আমি চট্টগ্রামের কসমোপলিটন আবাসিক এলাকার দারুল আরক্বাম আল্ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও তৎসংলগ্ন জামে মসজিদের ঈমাম হাফেজ মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ আনসারির প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পুত্রবধু মেহ্বুবা ইফ্‌ফাত বি. এফ. এ. (অনার্স) মুদ্রিত প্রতিলিপিটির বাংলা বানান শুদ্ধকরণে সাহায্য করায় তার নিকটও কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থপঞ্জি

১ Parallel Universes & Evidence ...
www.spac.com>32728-parallel-...

২ Big Bang Theory I Definition of Big Bang Theory by Merriam-Webster
www.merriam-webstar.com > big...

৩ How Soon Can You Find Out Baby's Sex ? - Parents Megazine
www.parents.com>my-baby>qa...

৪ Top 10 Isaac Newton Quotes -BrainyQuote
www.brainyquote.com>authors

৫ The Sabbath Breakers-[Articles]I
www.muslimfootsteps.com>q =THE-SA...

৬ Classical conditioning-Wikipedia
en.m.wikipedia.org>wiki>classi...
৭ Typhoon, Hurricane, Cyclone Latest Stories-National Geographic
news.nationalgeographic.com>...
৮ Tidal bore-Wikipedia
en.m.wikipedia.org/wiki/Tidal-bore...
৯ Blue-ringed octopus-Wikipedia
en.m.wikipedia.org > wiki > Blue-...
১০ Tropical Cyclones I World Meteorological Organisation
public.wmo.int >About-us >faqs -...
১১ Qutb, S. 2001. Commentary on 'where the two seas meet'
www.arabnews.com
১২ Aquifer Wikipedia
en.m.wikipedia.org>wiki>Aquifer
১৩ Water distribution on earth -Wikipedia
en.m.wikipedia.org>wiki>Water...
১৪ Jabal al-Lawz-Wikipedia
en.m.wikipedia.org>wiki>Jabal...
১৫ Celestial sphere-Wikipedia
en.m.wikipedia.org>wiki>Celest...
১৬ How far does light travel in the ocean ?
oceanservice.noaa.gov
১৭ Scientists track subsurface waves the size of skyscrappers -New Atlas
Newatlas.com >inrerior -waves -size ...
১৮ Frank Press -Wikipedia
en.m.wikipedia.org>wiki>Frank...
১৯ Mountains as Pegs/Stakes? Do Mountains have roots that resembles pegs/Stakes ...
www.quran-errors.com >mountains-as- p..

২০ Mountains as Pegs/Stakes? Do Mountains have roots that resembles pegs/Stakes ...
www.quran-errors.com >mountains-as- p...
২১ What are the seven seas ?
oceanservice.noaa.gov
২২ Plant Species Numbers -Botanic Gardens Consevation International
www.bcgi.org > policy
২৩ What are coral reefs ? - Livingdreams.tv
livingdreams.tv > oceans > marine-ecology
২৪ What will happen to the sun after 5 billion years ?- Quora
www.quora.com > What-will-happ...
২৫ What Will Happen to the Earth When the Sun Dies ? - Steemit
steemit.com>science>what -will- ...
0 Khan, M.1413 A. H. Pabitra Qur'anul Karim (Translated into Bengali from urdu translation by Shafi, M.and Published by Khademul Haramine Sharif King Fahad Complex, Madina Monwwarah).
0 Ali, A.Y. 1934. The meaning of the Glorious Qur'an (Translated into English, New Edition, published by FARID BOOK DEPOT Ptv. Ltd. New Delhi-2)
0 Ibn Kathir, I. 1958. Tafseer Ibn Kathir (English,114 Surah's Complete)
archive.org >details>TafseerIbn..
0 Qadi Sana'Allah,P.1999. Tafsir Mazhari - Bangla translation
archive.org >details>TafsirMazh...

..